॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের পর্ববিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ ॥

॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের পর্ববিভাগ ॥

ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলি সমকালীন বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । দেশ, বিচিত্রা, শনিবারের চিঠি, অরণি, পরিচয়, অলকা, কালি কলম, বর্ষশেষ, তরুণের স্বপ্ন, মনোবীণা, মণিমঞ্জরী, আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতি প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় তাঁর গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে । ছোটগল্প রচনার প্রথম অবস্থা থেকেই তিনি গল্পগুলিকে বিভিন্ন গল্পগ্রন্থে পৃথক পৃথক গল্পগ্রন্থের নাম অনুযায়ী প্রকাশ করেছেন । এই গল্পগ্রন্থগুলি প্রকাশকাল অনুযায়ী বিচার করলে তাঁর গল্পমালাকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায় । এছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত কিছু ছোটগল্প তাঁর মৃত্যুর পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে । এগুলিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ রূপে গণ্য করে গল্পগুলিকে তালিকাভুক্ত করা হল । সব মিলে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর ছোটগল্পের সংখ্যাও উল্লেখ করা গেল । তবে এছাড়াও তাঁর কিছু কিছু গল্পগ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, তিনি ইচ্ছে করেই করেন নি । কারণ যে লেখা তাঁর নিজের ভালো লাগেনি তা তিনি কোন গল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করতেন না । তিনি নিজেই বলেছেন, " কোনো খ্যাতির আকর্ষণ আমাকে কখনো প্রলুব্ধ করেনি আমার লেখা কে কিভাবে গ্রহণ করেছেন, যে কথা ভাবিওনি কোনো দিন । নিজের আনন্দে লিখেছি, কাগজে বেরিয়েছে যখন মূল্যহীন মনে হয়েছে তখন তাকে আর স্বীকার করিনি । আমার বহু লেখাকেই আমি এইভাবে বিস্মৃতির বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছি - শুধু জানি : ফুরায় যা দেরে ফুরাতে ।" [৩] তাঁর গল্পের পর্ব বিভাগের মধ্যে কোন কোন গল্প অন্য গল্পগ্রন্থে পুনরায় স্থান পেয়েছে বলে তা গল্পের সংখ্যা নির্ণয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে।

পর্ব	কালসীমা	গল্পগ্রন্থের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা	গল্পের তালিকা
প্রথম বীতংস থেকে বনজ্যোৎস্না (প্রথম সংস্করণ)	বাংলা ১৩৫২ সাল থেকে ১৩৫৩ সাল পর্যন্ত ।	বীতংস	বাংলা ১ লা বৈশাখ ১৩৫২ সাল ইং ১৯৪৫ খ্রীঃ	বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা	বীতংস, ষাঁড়, নীনা, প্রদীপ ও প্রজাপতি, তৃণ,

৩ . জ্যোতি প্রসাদ বসু (সম্পাদিত) : গল্প লেখার গল্প : ১ম সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৫৫, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃ : ১১৪

পর্ব	কালসীমা	গল্পগ্রন্থের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা	গল্পের তালিকা
	ইং ১৯৪৫ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৬ খ্রীঃ পর্যন্ত।				নিশাচর ও সৈনিক।
		ভাঙাবন্দর	বাংলা - ভাদ্র ১৩৫২ সাল ইং ১৯৪৫ খ্রীঃ	কমলা পাবলিশিং হাউস ৮।১ এ হরিপাল লেন, কলিকাতা	ভাঙাবন্দর, কবর, তীর্থযাত্রা, ছলনাময়ী, নূচির উপাখ্যান, নক্র-চরিত, আত্মহত্যা
		দুঃশাসন	বাংলা, আশ্বিন ১৩৫২ সাল ইং ১৯৪৫ খ্রীঃ	বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা	দুঃশাসন, কালো-জল, পুষ্করা, ভাঙাচশমা, বনবিড়াল, খড়্গ, মমি, ডিম, পাইপ
		জন্মান্তর	বাংলা -১৩৫২ সাল ইং ১৯৪৬ খ্রীঃ	মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, সুমথনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত।	জান্তব, দুর্ঘটনা, ফলশ্রুতি, জন্মান্তর, বৃত্ত, দুর্নয্যো, বিভীষণ, লড়াই, ব্যাধি, একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকা।
		ভোগবতী	বাংলা ১৩৫২সাল ইং ১৯৪৬ খ্রীঃ	ভারতীভবন, পরিবেশক স্টুডেন্টস্ বুক সাপ্লাই ১৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা	ভোগবতী, বনতুলসী, জীবাণু, চারতলা, ডিনার, প্র্যাকটিস, ধন্বন্তরি, পিতরি, তরফদার, একটি শত্রুর কাহিনী, ইতিহাস।

পর্ব	কালসীমা	গল্পগুচ্ছের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা	গল্পের তালিকা
		বনজ্যোৎস্না	বাংলা ১৩৫২ সাল ইং ১৯৪৬ খ্রীঃ	পুস্তকালয়, ২৯ বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা ডি.সি ব্যানার্জী কর্তৃক প্রকাশিত	বনজ্যোৎস্না, সোনালীবাঘ, মৃত্যুবাণ, চক্রব্যূহ, বারো মল্লিকের বিল, বীরভোগ্যা, অনুশীলনের শেষ-খুন, ঘূর্ণি। এই পর্বে মোট গল্পের সংখ্যা = ৫৩
দ্বিতীয় (কালাবদর সাল থেকে জাটিয়ালী)	বাংলা ১৩৫৫ থেকে ১৩৬৪ সাল পর্যন্ত ইং ১৯৪৮ খ্রীঃ থেকে ১৯৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত।	কালাবদর	বাংলা ভাদ্র, ১৩৫৫ ইং ১৯৪৮ খ্রীঃ	দি গ্লোব পাবলিশার্স ১নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২ প্রকাশক, প্রফুল্ল বসু	টোপ, শৈব্যা, ইজ্জৎ, অপঘাত, বন্দুক, শিল্পী শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু, উস্তাদ মেহেরী খাঁ, কালাবদর
		শ্বেতকমল	বাংলা ১৩৬১ সাল, কোজাগরী পূর্ণিমা, ইং ১৯৫৪ খ্রীঃ	প্রকাশক - মণিমোহন কুমার, কুমারিকা ৩৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯	বাইশে শ্রাবণ, মর্গ, তিমিরাভিসার কালনেমি, অধিকার, জন্মভূমিশ্চ, শ্বেতকমল, হাত, খাসবন।

পর্ব	কালসীমা	গল্পগুচ্ছের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা	গল্পের তালিকা
		নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুনির্বাচিত গল্প	বাংলা ৭ই কার্তিক, ১৩৬১ ইং ১৯৫৪ খ্রীঃ	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ, ১৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা -৭	জন্মান্তর, ধর্ম, বৃষ্টি, কালাবদর, ধন্বন্তরি, অবাদ, সপ্তপদী, মারীচ, জবুতী, ইজ্জৎ, আন্ধলিকার শেষ খুন, তৃণ, নিশাচর, মৃত্যুবাণ, রায়, শিং ও খাটে (এবং আজিজুন)
		নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প (জগদীশ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত)	বাংলা অগ্রহায়ণ ১৩৬১ ইং ১৯৫৪ খ্রীঃ	বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রকাশক শচীন্দ্রনাথ, মুখোপাধ্যায়, প্রকাশভবন ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩	বীতংস, হাড়, নক্রচরিত, দুঃশাসন, টোপ, ফলশ্রুতি, একটি শত্রুর কাহিনী, জান্তব, উস্তাদ মেহেরা খাঁ, বনজ্যোৎস্না, পুষ্করা, দুর্ঘটনা, ভাঁটিচশমা, বনতুলসী, ইতিহাস, বনে দেখা আলো, সৈনিক।
		গন্ধরাজ	বাংলা আশ্বিন, ১৩৬২ ইং ১৯৫৫ খ্রীঃ	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩ - ১ -১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬	ধুম, কন্দর্পপুরুষ, তাস, লজ্জা, ইদ্রিসের মোরগ, হরিণের রঙ, গন্ধরাজ, উন্ময, দরজা, নতুন গান।

পর্ব	কালসীমা	গল্পগ্রন্থের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা	গল্পের তালিকা
		উর্বশী	বাংলা ১৩৬৩ সাল, মহালয়া ইং ১৯৫৬ খ্রীঃ	প্রকাশিকা আভারানী মিত্র, ৪৬।৭ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা - ৯	কলঙ্ক, ধাঁস, পূর্ণা, দক্ষিণান্ত, একটি অমর রাত্রি, প্রতিনায়ক, দায়মোচন, মর্যাদা, নেতার জন্ম, উর্বশী
		নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ	বাংলা ১৩৬৩ সাল ইং ১৯৫৭ খ্রীঃ	মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা -১২	দর্পণ, প্রপাত, জান্তব, দুর্ঘটনা, ফলশ্রুতি, জন্মান্তর, বৃত্ত, দুর্নয়, বিভীষণ, ব্যাধি, একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকা, বাইচ, গোত্র, গোখরো।
		ভাটিয়ালী	বাংলা বৈশাখ, ১৩৬৪ সাল ইং ১৯৫৭ খ্রীঃ	কথামালা প্রকাশনী ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা -১২ প্রকাশক, শ্রী বীরেশ্বর বসু, ১৯।এ।১বি, রাজা মনীন্দ্র রোড, কলিকাতা - ৩৭	অনেকবেশী আকাশ দেনা, অভিনয়, গোত্র, পলায়ন, ইন্টারভিউ, মার্যাদের এক রাত, ভাটিয়ালী
					এই পর্বে মোট গল্পের সংখ্যা = ৬১

পর্ব	কালসীমা	গল্পগ্রন্থের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা	গল্পের তালিকা
তৃতীয়, রূপমতী থেকে বনজ্যোৎস্না (২য় সংস্করণ)	বাংলা ১৩৬৬ সাল থেকে বাংলা ১৩৭৬ সাল পর্যন্ত ইং ১৯৫৯ খ্রীঃ থেকে ১৯৬৯ খ্রীঃ পর্যন্ত	রূপমতী	বাংলা ভাদ্র, ১৩৬৬ সাল ইং ১৯৫৯ খ্রীঃ	বসু সাহিত্য সংসদ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ প্রকাশক শ্রী অমিয় বসু	ছায়াসঙ্গিনী, নীলকণ্ঠ, অন্ত্যেষ্টি, বাড়ীবদল, খেলনা, পান্থ-নিবাস, ক্ষত, করাত
		সাপের মাথায় মণি	বাংলা - অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ সাল ইং ১৯৫৯ খ্রীঃ	বিভূতিভূষণ ঘোষ, এভারেস্ট বুক হাউস, ১৪ সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা -৩০	খাঁচা, নকল, সিধে, চায়ের বিকেল; ব্লেড, পদধ্বনি, অনুকম্প, চাবি, সূর্য আসবে, প্রহরী, সুখাত, খুনী, আকাশ, টেস্টটিউব, সাপের মাথায় মণি।
		শুভক্ষণ	বাংলা ১৩৬৭ সাল ইং ১লা জুলাই ১৯৬০ খ্রীঃ	সুরভি প্রকাশনী ১ কলেজ রো, কলিকাতা -৯	কিরণ বাঁধা – ভাল্লুক; কেয়া, সম্ভার, উদ্বোধন, উত্তরপুরুষ, খুনী তিনমাথা, ময়লা, একটি চিঠি, রেকর্ড, তিতির, শুভক্ষণ।

পর্ব	কালসীমা	গল্পগ্রন্থের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা	গল্পের তালিকা
		একজিবিশন	বাংলো ফাল্গুন ১৩৬৮ ইং ১৯৬২ খ্রীঃ	মানবিকা দত্ত, অভিজিৎ প্রকাশনী সমবায় লিঃ ৮।১ কলেজ রো, কলিকাতা - ৯	প্রতিপক্ষ, মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু, কান্ডারী, একজিবিশন, অমনোনীতা, মিলটি, আতিথ্য, মধুবন্তী, দাম, রানীর গল্প, গলি, রাঙামাসিমা।
		লীলাবতী	বাংলো ১লা বৈশাখ, ১৩৭১ ইং ১৯৬৪ খ্রীঃ	শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস ৫।১ এ কলেজ রো, কলিকাতা - ৯	রাজপুত্র, এক জঙ্গল থেকে, আফ্রোদিতে, সমবেদনা, চতুর্থ কোণ, আমার কথা, কাদা, আমার মার গলা, দ্বিতীয় শরীর।
		ছায়াতরী	বাংলা ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৭৩ ইং ১৯৬৬ খ্রীঃ	অরুণিমা পাবলিশার্স দীপক কুমার পাল, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২	নীলঘোড়া, শেষচূড়া, তমস্বিনী, সমুদ্র-তীরে দাঁড়িয়ে, কুয়াশা, হলদে চিঠি, সেই পাখীটা, একটি কৌতুকনাট্য, সুখ, ট্যাক্সিওয়ালা।
		বনজ্যোৎস্না (২য় সংস্করণ)	১লা ভাদ্র, ১৩৭৬ ইং ১৯৬৯ খ্রীঃ	১১ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২	বনজ্যোৎস্না, বনতুলসী, হয়তো, সেই মৃত্যুটা, দোসর, বিসর্জন, কালপুরুষ।

এই পর্বে মোট গল্প সংখ্যা = ৭০

পর্ব	কালসীমা	গল্পগ্রন্থের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা	গল্পের তালিকা
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে আশাদেবী কর্তৃক সম্পাদিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প গ্রন্থ	বাংলা ১৩৭৮ সাল থেকে ১৩৮৬ সাল পর্যন্ত, ইংরাজী ১৯৭১ খ্রীঃ থেকে ১৯৭৮ খ্রীঃ পর্যন্ত	স্বর্ণ	বাংলা ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৮ ইং ১৯৭১ খ্রীঃ	গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা -১২	স্বর্ণ, ধাত্রী, সীমান্ত, ঘৃণা, দিনান্ত।
		লক্ষ্মীর পা	বাংলা ১৩৮৫ ইং ১৯৭৭ খ্রীঃ	পি. এন. সিংহ, জহর ঘোষ ঈশান ৭১/২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা -৯	লক্ষ্মীর পা, দ্যুত, প্রণতি, কমিশন, যাচাই, গাছের সাক্ষি, অন্নপূর্ণ, আরো একজন, মোহিনের কাকা, মাধ্যাকর্ষণ, রেকর্ড।
		অষ্টাদশী	বাংলা-আশ্বিন ১৩৮৬ সাল ইং ১৯৭৮ খ্রীঃ	প্রসূন কুমার বোস, সমকাল প্রকাশনী ৮/২ এ লোয়ালটুলি লেন, কলি - ৭০০০১৩	মুকুন্দর পাত্রী, মর্যাদা, কে সে লোকটা, অর্জুন, সোনচাঁপার বৃন্ত, ক্যারিকেচার, মিছিলের মধ্যে, সুন্দর, রিবন বাঁধা অলক, ছায়াসঙ্গিনী, রাজপুত্র, ছোরা, ফিউজ, বিসর্জন, সিংহনাদ, দিনান্ত, মদনভস্ম, অকলঙ্ক।

পর্ব	কালসীমা	গল্পগ্রন্থের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা	গল্পের তালিকা
		আলেয়ার আলো	এপ্রিল, ১৯৮২	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা -৭৩	আলেয়ার রাত, টুটুন, আসান-সোলের লোকটা।

এই পর্বে মোট গল্পের সংখ্যা : ২৮

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুস্তকাকারে প্রকাশিত সব গল্প এখনও রচনাবলীতে প্রকাশিত হয়নি। এখনও পর্যন্ত লেখক পত্নী আশাদেবী ও পুত্র অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় রচনাবলীর দশম খণ্ড অবধি প্রকাশিত হয়েছে। একাদশ খণ্ড সম্পাদনা করেছেন আশাদেবীর মৃত্যুর পর পুত্র অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বর্তমানে তাঁর রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও সবিতেন্দ্রনাথ রায়। কিন্তু রচনাবলীতে 'জন্মান্তর', 'রূপমতী', 'শিলাবতী', 'ছাতিয়ানী' ও 'সাপের মাথার মণি' গল্পগ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয়নি। কাজেই গল্পসংগ্রহের ব্যাপারে লেখকের রচনাবলীর উপরে যেমন নির্ভর করা হয়েছে তেমনি পৃথকভাবে প্রকাশিত তাঁর গল্পগ্রন্থের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু কিছু গল্প একটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য গ্রন্থে আবার সংকলিত হয়েছে। এজন্য তাঁর 'সুনির্বাচিত গল্প' 'শ্রেষ্ঠগল্প', 'গল্পসংগ্রহ', 'বনজ্যোৎস্না'; 'ঘূর্ণি', 'অষ্টাদশী', 'লক্ষ্মীর পা' গ্রন্থে যে গল্পগুলি পুনরায় স্থান পেয়েছে সেগুলিকে প্রতিপর্বে বাদ দিয়ে তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত মোট গল্পের সংখ্যা = ২১২ (৫৬+৫৮+৭০+২৮) তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু কিছু গল্প এখনো নানা পত্রিকায় ছড়ানো যা গ্রন্থাকারে তিনি প্রকাশ করেননি। পত্নী আশাদেবী 'ঘূর্ণি' 'লক্ষ্মীর পা', 'অষ্টাদশী' ও 'আলেয়ার আলো' নামে গল্প সংকলনে তাঁর গ্রন্থাকারে পূর্বে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কিছু গল্প সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাসির গল্পগুলিকে আশাদেবী সংকলিত করেছেন সমগ্র কিশোর সাহিত্য - ১, ২, ৩, ৪ এ। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে হাসির গল্পগ্রন্থগুলির উল্লেখ করে এই ধরণের গল্প রচনায় লেখকের শিল্প-দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

।। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের শ্রেণী বিভাগ ।।

একটি বিশেষ সংজ্ঞা বা আর্টি থেকে ছোটগল্পের জন্ম হলেও একালের ছোটগল্প জীবনের অজস্র জটিলতার আবর্তে নানাভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে । ছোটগল্পের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে ইংরেজী সাহিত্যে ছোটগল্পের তনক পিচেনশন ছোটগল্পের শ্রেণী বিভাগ করেছেন তিনভাগে — Story of Plot, Story of Character ও Story of impression অর্থাৎ (১) কাহিনী প্রধান (২) চরিত্রপ্রধান (৩) প্রতীতি প্রধান গল্প । এ সম্পর্কে E. A. Cross বলেছেন, 'A story opening with conversation would be a story of character . one beginning with a descriptive paragraph would be throughout a story of setting. And one whose first paragraph related a happening would be considered a story of incident'[৩১]

ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, " সবদেশে ছোটগল্পের ত্রিবিধ প্রবণতা দেখা যায় । ঘটনাপ্রধান্য, চরিত্রপ্রধান্য ও ভাবপ্রধান্য । প্রথম পর্যায়ের গল্প ঘটনার বৈচিত্র্যের উপরই নির্ভর করে এবং বৃত্তান্তের দিকে ঝুঁকে পড়বার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা তার মধ্যে থাকে । দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্প একটি বিশেষ ব্যক্তিচরিত্রকে অথবা মানব চরিত্রের কোনো একটি অপূর্ণতাকেই পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করে । তৃতীয় পর্যায়ের গল্প কোনো অনুভূতি, উপলব্ধি বা আবেগকে প্রকাশ করে - এই জাতীয় রচনাতেই দার্শনিকতা ও কাব্যধর্মিতার অঙ্কুর নিহিত থাকে ।"[৩২]

---

৩১. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা, ১৩৮১, ১ম সংস্করণ, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ১০৮

৩২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যে ছোটগল্প : শ্রাবণ, ১৩৮৪, ৫ম সংস্করণ, ডি.এম. লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা - ৩১২

সুতরাং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগ করার ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশিত শ্রেণী বিভাগকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি । এই কারণে তাঁর ছোটগল্পগুলিকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘটনাপ্রধান , চরিত্রপ্রধান ও ভাবপ্রধান(ঘটনামুখ্য , চরিত্র মুখ্য ও ভাবমুখ্য) গল্প হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গল্পগুলির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য তুলে ধরা হল ।

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
বীতংস	কমিশনের লোভে প্রতারক সুন্দরলাল সাধু সেজে কুলি যোগানোর কাজে ব্যস্ত । মড়ক , মহামারী আর করম দেবতার কোপ থেকে বাঁচাতে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাঁওতালদের নিয়ে সে চলেছে আসামের চা বাগানে । শাড়ি , চুড়ি , আর শহরের লোভ দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলেছে সাঁওতাল মেয়ে বুধনীকেও ।	চরিত্রপ্রধান
হাড়	রায়বাহাদুর এইচ , এল চ্যাটার্জী প্রশান্ত মহাসাগর ও তাহিতি দ্বীপ থেকে সংগ্রহ করে আনেন অলৌকিক যাদু-মন্ত্র সমৃদ্ধ হাড় । অন্যদিকে দেশজোড়া দুর্ভিক্ষের দিনে মনোহর পুকুর পার্ক থেকে ভেসে আসে বুভুক্ষু মানুষের কান্না , ডাস্টবিনে কুকুরে মানুষে খাদ্যের জন্যে চলে কাড়াকাড়ি , আর কঙ্কাল সার ছেলে তার ধারেই চুষে চুষে খেতে থাকে হাড় ।	চরিত্রপ্রধান
নীলা	সীতাগঞ্জ হীরালাল সুগার মিলের ম্যানেজার ডাক্তর নটরাজন তার পার্সোনাল সেক্রেটারী কুন্তলা রায়ের সম্মোহিনী শক্তির কাছে পরাজিত । ডাক্তর কুন্তলাকে পেতে চেয়েছিল । কুন্তলা ভালোবাসার ভান করেছিল , ধরা দেয়নি । দারিদ্র্য , অস্বাস্থ্য আর ম্যালেরিয়াপীড়িত	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
	বর্ণনাকে ভাস্কর অবজ্ঞা করেছিল বলে কূটনা কৌশলে তার প্রতিশোধ নেয়। এই কারণেই অধিচাষীদের প্রতি সুবিচারের দাবীর অপরাধে শক্তি সান্যালকে ছাঁটাই করেও পরে তাকে আবার কাজে বহাল করতে বাধ্য হয়েছিল ভাস্কর।	
প্রদীপ ও প্রজাপতি	নাগরিক জীবনযাত্রার স্বপ্নে বিভোর টুনু বৌদি সুখকর জীবনের আশায় সোনা পিসিমার মৃত্যুর পর দেশ ছেড়ে এসেছেন কলকাতায়। কিন্তু কলকাতার হরিহর দাস বাই লেনের অশ্লীল নোংরা জীবন, ভাড়াবাড়ি আর বাড়িউলির তাচ্ছিল্যকর ব্যবহারে টুনু বৌদির জীবনের স্বপ্ন ভেঙে যায়। স্বামী চাকরী হারায়। ছেলে রক্ত আমাশায় ভুগে বিনাচিকিৎসায় মরে, নিজে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ওষুধ পান না।	ঘটনাপ্রধান
তৃণ	খাওয়া পাড়ার বসির মাঝি মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে, কিন্তু তোলা ও নজরানা দিয়েও থানা আর হাসানপুরের লোকজনের অত্যাচারের হাত থেকে সে রেহাই পায়নি। অবশেষে পত্নী রোমেনাকেও সে যখন হারাতে বসেছে তখন পাইকারের পরামর্শে সে রাতের অন্ধকারে বিলের জলে নৌকো ভাসিয়ে হাসানপুর ছেড়ে চলে যেতে থাকে। পথে নৌকো হঠাৎ আটকে গেলে বসির জলে নামে ও অনাদি গোখরোর কামড়ে চিৎকার করে ওঠে। আর সুযোগ বুঝে পাইকার রোমেনাকে নিয়ে বিলের মুখে নৌকো সরিয়ে নেয়।	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
নিশাচর	পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে একবিপ্লবী বৃষ্টিঝরা শীতের নৈশ অভিসারের মধ্য দিয়ে মহানগরীর ফুট-পাতের উনুনের গর্তে, বারবনিতার ঘরে, ভিখিরীর আড্ডায় এবং সবশেষে শ্মশানের পরিত্যক্ত শূন্য-খাটিয়ায় শয়ন করে আবিষ্কার করলেন রাতের কলকাতায় ভিক্ষুক আর ভবঘুরে চোর আর বারবণিতা, গুণ্ডা আর কুলত্যাগিনীর মধ্যে কোন ব্যবধান নেই।	ভাবপ্রধান
সৈনিক	কুমার দহ গ্রামের দেবীকোট রাজবংশের উত্তর-পুরুষ জমিদার চন্দ্রচৌধুরীর আমলে পানগ্রামের টিলায় সাঁওতালেরা এসে আশ্রয় পেয়েছে। চন্দ্রচৌধুরীর স্নেহচ্ছায়া, বর্ষার জল, কাঞ্চনের কুলছাপানো ঢল আর কঠোর পরিশ্রম দিয়ে তারা ঘরে তুলে আনে সোনার ধান, ভুট্টা আর তামাক। কিন্তু পুত্র ইন্দ্রচৌধুরী, ইতিহাসের এম.এ পাশ গাঁয়ের শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের উৎখাত করে মাটির নিচ থেকে আবিষ্কার করতে চাইলেন বাংলার অতীত ইতিহাসকে। চন্দ্রচৌধুরীর আমলের হাতী নীলবাহাদুরকে তিনদিন অভুক্ত রেখে তিনি লেলিয়ে দিলেন সাঁওতালদের ওপরে। ছুঁড়লেন গুলি। কিন্তু সাঁওতালদের তীরের আঘাতে নিহত হল নীলবাহাদুর। তার শরীরের চাপে ইন্দ্রচৌধুরীর মোটর বেবি অস্টিন গুঁড়ো হয়ে গেল।	ঘটনাপ্রধান।

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
ভাওবিন্দর	সুনন্দার তীরে পঁচিশবছর আগের চীনে বাজারের জমজমাট জীবনযাত্রা, রমরমা ব্যবসা, জাহাজের আনাগোনা, রূপোপজীবিনীদের বাস - এইসব অতীত স্মৃতির ওপর দাঁড়িয়ে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীধর মিত্তির ভাওবিন্দরকে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করেও সফল হননি, বরং ঐ নতুন যুগের ম্যানেজার সাহাবাবুকে সন্তুষ্ট করতে মালতী নামে একটি মেয়ের লোভ দেখিয়ে অপমানিত হয়েছেন।	চরিত্রপ্রধান।
খবর	মিথ্যে চুরির অপরাধে দরিদ্র মাকে শাস্তি দেবার অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মোড়লের ছেলেকে খুন করে শানওয়াজ জেল খাটে। জেল থেকে বেরিয়ে সে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় ঘুরে বেড়িয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের দিনে ধানচালের কনট্রাক্ট নিয়ে চোরাবাজারে বিক্রি করে সে বড় লোক হয়েছে। বড়লোকদের টেক্কা দিয়ে আমেরিকান মডেলের ঝকঝকে গাড়ি কিনেছে। তীব্র প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হয়ে অ্যাকসিডেন্টের ভয়কে অগ্রাহ্য করে বন্ধুকে সাথে নিয়ে সে গ্রামে ছুটে এসেছে। কিন্তু গ্রামে ক্ষুধা, ব্যাধি আর মৃত্যুর দৃশ্য দেখে তার গাড়ির গতি রুদ্ধ হয়ে আসে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত বুভুক্ষু বাংলার মৃত্যুশয্যারূপী খবর গুলোকে দেখে তার প্রতিশোধের আগুন নিভে যায়।	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
তীর্থযাত্রা	যুদ্ধ, ব্ল্যাকআউট আর দুর্ভিক্ষের দিনে অর্থলোলুপ নরোত্তম ঠাকুর কালীঘাটের মন্দির দর্শনের নাম করে বাংলার গৃহলক্ষ্মীদের কলকাতায় বিক্রী করতে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অর্থপিশাচ নরোত্তম যখন নৌকো থেকে নেমে সুখীকে ছেড়ে দেবার নাম করে গোলাম মহম্মদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিক্রি করে ফিরে আসে তখন এই ঘটনায় নৌকোর ধৈর্যহারা মাঝির (ফরিদের) লগির ঘায়ে নরোত্তম বালি আর কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।	চরিত্রপ্রধান।
ছলনাময়ী	দক্ষিণ কলকাতার শ্মশানে কাপালিক ভৈরবানন্দ আর সন্ন্যাসী ভূমানন্দ দুজনেই সংসার ছেড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে ছলনাময়ী নারীর কারণেই। অবশেষে ভৈরবী নামে এক সন্ন্যাসিনীর আবির্ভাবে নারীসঙ্গলোলুপ ভৈরবানন্দ এক রাতে তার উপবাসী কামনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভৈরবীর ওপর। তাতে ভূমানন্দের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। উভয়ের মধ্যে খুনোখুনি, রক্তারক্তির উপক্রম হলে ভৈরবী সুযোগ বুঝে অন্ধকারে পালিয়ে যায়।	চরিত্র - প্রধান।
লুচির উপাখ্যান	সিদ্ধেশ্বরবাবু যুদ্ধের বাজারে চালে কাঁকর মেশানোর কনট্র্যাক্ট নিয়ে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করেন, অথচ ছেলের মাস্টারমশাইকে তিনি যখন ভরপেট লুচি খাইয়ে তৃপ্ত করেন তখন তাতে কাঁকর, বালি কিংবা কোনো ভেজাল থাকে না।	চরিত্র - প্রধান।
পাণ্ডুলিপি	নিঃসন্তান বিপত্নীক জমিদার তারাকান্ত ভ্রাতুষ্পুত্র বিভূতিকে ক্যানভাসের ওপর আঁকা তাঁরই নিজেরই নিখুঁত প্রতিরূপ হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সোনার মেডেল পেয়ে বিভূতি যখন কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরেছে তখন তারাকান্ত দেখলেন তাঁর বাঁধাধরা ফরমুলার বাইরে বিভূতি আবেগে স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে রীতিমতো ক্ষমতাময় সাহিত্যিকে পরিণত।	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
আত্মহত্যা	পিনাকীর সাথে সুপ্রভার বিয়ে অনেকটা প্রণয়-ঘটিত। কিন্তু ক্রমে পিনাকীর অন্তরে এই জাগতিক জীবনের প্রতি একটা অকৃত্রিম নিরাসক্তি দেখা দেয়। শ্বশুর বাড়িতে এসেও চায়ের টেবিলের হালকা গল্পে তার মন লাগে না। স্বাচ্ছন্দ্যতার মধ্যে তার জীবনের ত্রিশ বছর এগিয়ে গিয়েও সে তার পুত্রের কাছ থেকে উদাসীন ব্যবহারই কল্পনা করেছে। তাই Porphyria's lover এর মতো ভালোবাসার উজ্জ্বল মুহূর্তকে চিরজীবী করতে সুপ্রভার উপস্থিতিতে আনন্দের চরম মুহূর্তের মধ্যেও সে জীবনের ছেদ টেনেছে আত্মহত্যার মাধ্যমে।	ভাবপ্রধান
নষ্টচরিত্র।	মুখে অধর্মের টাকা লোকসান এই আদর্শবাক্য আওড়ালেও সোনাপাড়া হাটের জাদরেল মহাজন ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নিশি কর্মকার রাতের অন্ধকারে ডাকাতদের ঠকিয়ে সোনাদানা মালপত্র ঘরে তুলে নেয়। বিমল্ব হয়েও বিশাখাকে সে সেবাদাসী করেছে। দুর্ভিক্ষেরদিনে ইব্রাহিম দারোগাকে ঘুষ দিয়ে সে চাল মজুত করে, ডাকাতদের মালপত্র হজম করে। অথচ এই ইব্রাহিম দারোগাকে একদিন সে আবিষ্কার করে বিশাখার ঘরে। বর্ষার জলে তার চালের গুদামেও ওঠে পচা চালের দুর্গন্ধ।	চরিত্রপ্রধান।
কালোজল	শ্বশুরবাড়ি থেকে রাগ করে বেরিয়ে এসে তারাপদ গঙ্গাপারের একটি পশম কারখানায় কাজ পায়। পাঁচ বছর বাদে আড়িয়াল খাঁর বুকে শীতল মাঝির নৌকোয় ভেসে	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	মধুগাঁয়ে ফিরে এসে সে দেখল শ্বশুর মারা গেছেন, ভানু নিরুদ্দেশ আর স্ত্রী অরুণা জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। শীতলমাঝির কাছে এ দৃশ্য নতুন নয়। দুর্ভিক্ষের দিনে তারও চিন্তা হয় পরিবার পরিজনের জন্যে। কিন্তু জীবিকার প্রয়োজনে বিবেকে বাধলেও মথুরা দাসের মতো চোরা কারবারির চালের বস্তা রাতের অন্ধকারে তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে হয়।	ঘটনাপ্রধান
পুষ্করা	মারী আর মন্বন্তরের কবল থেকে গ্রামের মানুষকে রক্ষা করতে সমৃদ্ধ মহাজন বলাই ঘোষ তিনশো টাকার লোভ দেখিয়ে পণ্ডিত তর্করত্নকে ডেকে এনেছেন। শুক্লা চতুর্দশীর রাতে কাশী কুমোরকে দিয়ে শ্মশানকালীর পৈশাচিক মূর্তি তৈরী করে তর্করত্ন বহুকষ্টে শিবাভোগ দিলেন। কিন্তু আসলে তা শিবাভোগ হয়নি। ডোমপাড়ার পাগলিটা শ্মশানকালীর রূপ ধরে শিবাভোগ খেয়ে গেছে। তর্করত্ন তা বুঝতে পারেনি।	ঘটনাপ্রধান।
ভাঙাচশমা	দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার ছাত্রবিহীন মাইনর স্কুলের ভাঙাচশমা পরিহিত বিকৃতমস্তিষ্ক হেডমাস্টারের প্রিপজিশান পড়ানোর ঐকান্তিক নিষ্ঠা অনেকবেশি আদর্শ সম্পন্ন। রিলিফের কাজে ব্যস্ত সাবডেপুটি অফিসার মফঃস্বল শহরের আট টাকা বেতনের স্কুল শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু পদমর্যাদা ও আর্থিক উন্নতির লোভে তিনি স্কুল মাস্টারীছেড়ে সাবডেপুটির পদে যোগ দিয়ে বৃত্তচ্যুত, লোভী ও স্বার্থপর মানুষে পরিণত হয়েছেন।	চরিত্রপ্রধান।

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
বনবিড়াল	মাধনার কাছে অন্নবস্ত্রের অভাব না হলেও নারীত্ব পদে পদে খর্ব হত বলে দুলী মাধনকে ছেড়ে বীরুয়ার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে । কিন্তু অসুস্থ বীরুয়াকে নিয়মিত মুরুয়া খাওয়াতে রাতের অন্ধকারে চুরি করে কবুতর সংগ্রহ করতে এসে গুলি খেয়ে সে পড়ে রইলে বোঝা গেল দুলীই আসল বনবিড়াল হয়ে । যে চুরির জন্যে মাধনাকে সে ছেড়ে এসেছে, বৃহত্তর প্রেমের আদর্শে আজ সেও সেই একই অপরাধে অপরাধী ।	ঘটনাপ্রধান ।
খড়্গ	গ্রামের তালুকদার হরিলাল খেতুর বউ ভোমরার দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেয় । খুনসালিসী মামলার জন্যে হরিলালকে ভয় পায় খেতু ও ভোমরা দুজনেই । দুর্ভিক্ষের দিনে একজোড়া বলদ আর গাড়ি সম্বল করে সোয়ারী বয়ে খেতুর দিন কাটত । কিন্তু মুচি বন্ধু নীলাইর তাড়ি খেয়ে খেতু একদিন ঘুমে বিভোর হলে চামড়ার লোভে নীলাই বিষ খাইয়ে তার বলদ দুটোকে মেরে ফেলে । এদিকে সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় হরিলাল এসে দাঁড়ায় ভোমরার কাছে । ভোমরা তাকে ফেরাতে পারবে না । কারণ খেতুকে বধ করার খড়্গ স্বরূপ খুনসালিসী মামলা তারই হাতে ।	ঘটনাপ্রধান
মমি	বস্তুবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ পুত্র মণীন্দ্র জমিদার রত্নেশ্বর রায়ের বংশের বাঁধা সড়কের ব্যতিক্রম । মণীন্দ্র পুঁজিবাদকে নির্মূল করে শোষণ মুক্ত সমাজগড়ার স্বপ্নে বিভোর । স্ত্রীর মৃত্যুর পর যে তরুণী জয়া তাঁর বহির্মুখী যৌবনকে নিয়ন্ত্রিত করত, মণীন্দ্রর আমলে তার মাসোহারা বন্ধ, বুড়ো নায়েব ত্রিভুবন অসন্তুষ্ট —	চরিত্রপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	এইসব অভিযোগ নিয়ে রত্নেশ্বর একদিন গভীর রাতে দস্যির মতো ইঙ্গিতে মণীন্দ্রকে সঙ্গে করে এলেন কুলদেবতার মন্দিরে। কিন্তু শতচেষ্টা করেও তিনি মণীন্দ্রকে রায়বংশের চিরাচরিত পথ ধরে চলতে রাজী করাতে পারলেন না। ব্যর্থ রত্নেশ্বর হু হু করে কেঁদে উঠলে মণীন্দ্র তাঁর বৈজ্ঞানিকের চোখ নিয়ে আবিষ্কার করেছে তাঁর বাবা রত্নেশ্বর মণি নন, মানুষ। দুর্বলতায়, অসহায়তায় তাঁর চোখ থেকে জল বেরিয়ে এসেছে।	চরিত্রপ্রধান
ডিম	মিলিটারীদের ডিম সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্ট নিয়ে প্যারীলাল জোর করেই বুড়ো রজনীকে ডিম সংগ্রহ করে রাখতে বলে বিদায় নেয়। সারাদিন পাথরের মতো কঠিন শীতে ঘুরে দশ আনা লাভের লোভে দু কুড়ি ডিম জোগাড় করে রজনী বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু পুত্রবধু সারদার ছেলেটা ডিম খাবার জন্যে ঘ্যান ঘ্যান করে উঠলে রজনী তার গলা টিপে ধরে। এই ঘটনায় সারদা লোহার শাবল তুলে নিয়ে রজনীর মাথায় বসিয়ে দেয়। ছেলেটা নিঃসাড় হয়ে পড়ে আর রজনীর ঘরে যে আগুন জ্বলছিল তাতেই মাথা রেখে নিসাড় হয়ে পড়ে থাকে। মাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে প্যারীলাল দেখে নেয় সমস্ত গ্রাম জ্বলছে। দারুণ শীতে সে যেন সেই আগুনই পোয়াচ্ছিল।	ঘটনা-প্রধান।
দুঃশাসন	কাপড়ের কারবারী দেবীদাস বিক্রি [illegible] জন্যে একজোড়া কাপড় দাদী থেকে [illegible] নারাজ। কিন্তু [illegible] অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে হাত দিয়ে বেরিয়ে আসে শাড়ীখানা। দুঃসময়ের বাংলার মানুষের বস্ত্র কেড়ে নিয়েছে [illegible] মনে দুঃশাসনের বস্ত্রহরণ কাহিনী। দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলা দেশে দেবীদাসের মতো দুঃশাসন বাংলার দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করেছে।	চরিত্র প্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর
পাইপ	পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক পি.কি. চৌধুরীর মতে প্রগতির একমাত্র পথই হল আগুন আর লোহার সার্থক ব্যবহার। তাঁর পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝতে পেরেছেন যে ধান, পাট কিম্বা গ্রামোন্নয়ন করে মানুষের সবটুকু কল্যাণ হয়না। মানুষের স্বাধীনতা হল যান্ত্রিকতায়, কলকারখানায় আর ফ্যাক্টরীতে। কিন্তু এই অগ্নিবন্দনা করী অধ্যাপক শেষ পর্যন্ত পাইপের আগুন মশারীতে লেগে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেলেন। খবরের কাগজে তাঁর এই অকাল মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছিল হয়।	ভাবপ্রধান
ভোগবতী	সাঁওতাল শুকলাল আর সোনার জীবন ভৈরব পাহাড়ে কাঠকেটে ঝোরার জল খেয়ে বেশ কাটছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে যেদিন শুকলাল আর সোনা শরীরের রক্ত জল করে কুড়ুল নিয়ে পাথুরে মাটির বুক চিড়ে রাস্তা তৈরীর কাজে লেগে যায় সেইদিন থেকেই তাদের জীবনে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। একদিন কাজ করতে করতেই সোনা গাড়ি চাপা পড়ে মরে। শুকলালের জীবন দুঃখে ভরে যায়। ভৈরব পাহাড়ের দেবতার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে সে ভৈরব পাহাড়ে গিয়ে গাছ কাটতে থাকে ও ঝোরার জলের নলে কুড়ুলের ঘা বসায়। কিন্তু সেন্ট্রীর গুলি খেয়ে শুকলাল রক্ত মাখা শরীর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে পাইপের ওপরে। আজো ভোগবতীর	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	স্নিগ্ধজল ট্যাপের মুখে শতধারায় ঝরছিল, কিন্তু তাতে শুকনালের রক্তের আভাস ছিল না ।	
বনতুলসী	বাংলাদেশের এক অখ্যাত স্টেশনে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসে রঞ্জন গ্রাম্য প্রকৃতিকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে । মাছ ধরতে গিয়ে নদীতীরের বনতুলসীর বনে তার জীবনের প্রথম নায়িকার দেখা পেয়েছিল সে , কিন্তু সেই নায়িকা চকিতের মধ্যে দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যায় । তারপর আবার উত্তরবর্ষে বেড়াতে এসে বন্ধুদের সাথে শিকার করতে গিয়ে রঞ্জন আসে বনতুলসীর বনে । বনতুলসী তাকে বহুদিন পরে কাছে পেয়ে তার সর্বগ্রাসী প্রেমের ক্ষুধায় আঁকড়ে ধরে । অবশেষে জঙ্গলের বাইরে তার টুপি কুড়িয়ে পেয়ে প্রকৃতির সেই উর্ণনাভ প্রেম থেকে তাকে রক্ষা করে বন্ধুরাই ।	ভাবপ্রধান
জীবানু	লণ্ডনে ডাক্তারীর শেষ ডিগ্রী নিয়ে কলকাতায় ফিরে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্থায়ী কীর্তি রেখে যাবেন সারদাপ্রসাদ । দেহবর্ণে আল্পসের তুষার আর চোখে সমুদ্রপাড়ের নীলিমা নিয়ে সেখানে তাঁর জীবনে এসেছিল নায়িকা গ্ল্যাডিস । কিন্তু স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্যে সুইজারল্যাণ্ড গিয়ে মেরুদণ্ড টিউবারকুলোসিস ধরা পড়ল সারদাপ্রসাদের । পরীক্ষা , প্র্যাকটিস কোথায় হারিয়ে গেল । এই আঘাত পেয়ে ব্যর্থ পঙ্গুজীবন নিয়ে সারদাপ্রসাদ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যৌবনদীপ্ত মানুষ দেখলেই ঈর্ষাবোধ করেন । তাই উত্তরবর্ষের পাহাড়ী বাংলোতে শুয়ে থেকে সারদা-প্রসাদ যখন দেখলেন বৃষ্টিভেজা পাহাড়ী দম্পতি এসে আশ্রয় নিয়েছে	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	তাঁরই বারান্দায়, তখন চাকরকে ডেকে তাদের তাড়িয়ে দিতে বললেন। যৌবনকে তিনি সইতে পারেননাবলেই, ওদের মধ্যেও তাঁর কঠিন রোগের মতো জীবাণুর অস্তিত্ব আছে বলে তিনি সন্দেহ করেন।	ভাবপ্রধান
চারতলা	নিরঞ্জন চ্যাটার্জী 'অগ্নিহোত্রী' কাগজের ম্যানেজিং এডিটর। শশধর, শ্যামানন্দ, শ্রীপতি, অজয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় আদর্শ আর বিশ্বাসের বজ্রবাণীতে অগ্নিহোত্রীকে একদিন নিরঞ্জন অসাধারণ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। পরবর্তীতে বিপ্লবী কাজে পিস্তল চালানোর অপরাধে পুলিশের গুলিতে শশধরেরx মৃত্যু হয়। জেল খাটে শ্যামানন্দ, শ্রীপতি ও অজয়। অগ্নিহোত্রী তাতে মরেনি। কয়েকজন বেকার ছেলের উৎসাহে অগ্নিহোত্রী আবার কুলি, মজুর, কেরাণী আর নির্যাতিত মানুষের কাহিনী শুনিয়ে দেশের মানুষকে ডাক দেয়। কিন্তু পত্রিকার এই আদর্শ টিকে থাকল না। ম্যানেজিং এডিটর নিরঞ্জন আদর্শ বিসর্জন দিয়ে পূর্বশত্রু এক ধনকুবেরের জয়ঢাক বাজিয়ে বড়লোক হয়ে উঠেন এবং উপাগত অনেকবার অনেক সুযোগ আত্মসাৎ করে দামী বিলিতি খাবার খেয়ে নতুন মোটরে চড়ে চারতলা বাড়ির কুশন আঁটা চেয়ারে বসে বসে ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট সিগারেট খান আর দেশের মানুষ থেকে নিজেকে এবং অগ্নিহোত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। কিন্তু তাঁর এই আভিজাত্যের সাথে মিশে ছিল অনেকের আদর্শ, শশধর আর প্রবীরের রক্ত। এদের মূল্য তিনি দেন নি।	চরিত্র প্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
ডিনার	কলেজে পড়বার সময় থেকেই রমাপতি স্টুডিয়োতে এক্সট্রা যুগিয়ে প্রচুর রোজগার করেছে। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষের দিনে স্পেকুলেশান করে সে আরো ফুলে ওঠে। কাজ হাসিলের জন্য নিজের ভাইঝিকে পর্যন্ত সাহেবের হাতে তুলে দিতে তার বাধে না। এমার্জেন্সী ফায়ার ব্রিগেডে সে কাজ পেয়েছিল, কিন্তু বেতন, সিগারেটের ডেভ্যাসে ব্যবসা আর চাকরী থেকে রমাপতি যা উপার্জন করেছে যুদ্ধ থেমে গেলে তার সবটাই ফুরিয়ে যায় বলে সে ডেডম্যানে পরিণত হয়েছিল। আবার খবরের কাগজে বড়লাটের বিবৃতিতে সে যখন জানতে পেরেছে দেশে দুর্ভিক্ষ আসবে, অ্যাটম বোমা আর ইরানের তেল নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধবে, তখন পরমানন্দে বন্ধুদের সে ডিনারে আপ্যায়িত করে।	চরিত্রপ্রধান
প্র্যাকটিস	কনস্টেবল অক্ষয়লাল চাঁদ মারীর সময় জীবন্ত মানুষকে গুলি না করলেও মেজরের নির্দেশে ঢিল ছোঁড়ার অপরাধে একটি কিশোরকে গুলি করে। গুলি খেয়ে হাতের পতাকাকে বুকের রক্তে রাঙা করে ছেলেটা মরে যায়। কিন্তু ব্যারাকে ফিরে অক্ষয়লাল বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়ে। মনে পড়ে তার প্রথম প্রেমের কিশোরী নায়িকা জানকীর স্মৃতি। তালুকদার সূর্যনারায়ণ চক্রান্ত করে জানকীকে সরিয়ে দিয়ে তার খোঁড়া চাকরের সাথে বিয়ে দেয়। থানার দারোগার সাথে ছিল সূর্যনারায়ণের যোগসাজস। এই কারণেই অক্ষয়লালের কাছে সূর্যনারায়ণ, থানার দারোগা আর মেজর সাহেবের মুখ বারে বারে একাকার হয়ে গেছে। এই মেজর সাহেবের নির্দেশেই তেরঙা পতাকা হাতে কিশোরটিকে গুলি করেছিল অক্ষয়লাল, যার বুকের রক্তের সাথে জানকীর কপালের মেটে সিঁদুরের প্রলেপের সাদৃশ্য সে খুঁজে পেয়েছে। তাই	ঘটনা-প্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর?
	চাঁদমারীর সময়ে সুযোগ পেয়ে অম্বুজলাল মেজরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল , কিন্তু প্র্যাকটিস ঠিক মতো হয়নি বলে লক্ষ্যবিদ্ধ করতে পারেনি । ফলে মেজর বেঁচে যায় ।	
ধন্বন্তরি	দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার ধগেন দাসের সাথে কম্পাউন্ডার যতীন সমাদ্দারের বিরোধ । কালাজ্বর , নিমোনিয়া , কলেরা - বসন্ত অরগ্যানিনিউট্রিশনের দিনে লোকে দু টাকা ভিজিটের ডাক্তারের পরিবর্তে আট আনা ভিজিট কিংবা লাউকুমড়োর বিনিময়ে কম্পাউন্ডারের কাছেই চিকিৎসা নেয় । একদিন রাতের অন্ধকারে হাসপাতাল থেকে চুপি চুপি আলমারি খুলে ওষুধ চুরি করতে গিয়ে ডাক্তারের কাছে ধরা পড়ে যায় কম্পাউন্ডার । আরেকদিন এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে অজ্ঞাতবশত ধন্বন্তরি কম্পাউন্ডার ভুল ডায়গোনাইজ করে নিজের স্ত্রীকেই মেরে ফেলেছেন । কারণ ডাক্তারকে ভিজিট দেবার মতো পয়সা তাঁরও ছিল না ।	চরিত্রপ্রধান
পিতরি	বাবনাতলী বস্তির চল্লিশ টাকা মাইনের পিটার সখানাথের মেয়ে সত্যভামা সংসারের নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেয়েছে । বড়লোকের ছেলে বি.এ.পাস ধীরেন তাকে বিয়ে করতে চায় । ধীরেন ভালো ছেলে একথা সখানাথ জানে , তবুও অসুস্থ স্ত্রী গিরিবালার সাথে সে সত্যভামার বিয়ের ব্যাপারে ইতস্তত: করেছে । আড়াল থেকে সত্যভামা সবই টের পেয়ে ধীরেনকে ফিরিয়ে দেয় । কিন্তু সত্যভামার মনে	চরিত্রপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?

পড়ে একদিন তার বাবা বুড়ো মেজম্যানের হাতে তাকে জৌরী দান করে মস্ত একটা লিফ্ট পেতে চেয়েছিল। পিতৃঋণ শোধ করার জন্যে তার জীবনের স্বপ্ন ভেঙে গেল। ধীরেনকে সে ফিরিয়ে দিল, কিন্তু পরিবর্তে বিষপাত্র তুলে নেবার মতো করে সে কুড়িয়ে নিল পাশের তেতলা বাড়ির একটি তরুণের চিঠি।

তরফদার — তরফদার একজন অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট মানুষ। কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটের অস্পৃশ্যতা নিবারণ সভায় তাঁর আশ্চর্য বক্তৃতা শুনে, পটল ডাক্তার দুশ্চরিত্র দ্বীপদুর্গের মতো বাড়িতে প্রেত সাধনা করে ও উত্তরবঙ্গের একটি গীর্জায় পাদ্রীতে পরিণত হয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর সাথে তিনি নিজের বাবচ্ছেদ টেনে ছোট গণ্ডীর মধ্যেই সাব সীমাসর্বস্ব রচনা করেছেন। তাছাড়া সাঁওতাল মেয়েকে বিয়ে করে চারপাশের সাঁওতাল আর ওরাঁওদের সুসমাচার শুনিয়ে আলোকে টেনে আনতে তাঁর প্রচেষ্টা দুরুত। সমাজের দিকে তাকিয়ে হতাশ ও অসহায় তরফদার যেন পিতা যীশুর শান্তিময় ক্রোড়েই সমস্ত উচ্চাশার পরিনির্বাণ খুঁজে পেতে চেয়েছেন। — চরিত্রপ্রধান

একটি শত্রুর কাহিনী — তুরী, মুণ্ডা আর সাঁওতালদের আলোর রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করতে ইংল্যাণ্ড থেকে পাদ্রী ডোনাল্ডস্ এদেশে এসে কুড়ি বছর ধরে লড় করে বুড়ো হয়েছেন। তাঁকে সাহায্য করতে এদেশে আসে জার্মান যুবক হ্যানস। কিন্তু হ্যানসের পথপ্রদর্শক জোসেফ ইম্যানুয়েলের হ্যানসকে ভালো লাগে না। কারণ হ্যানস এ দেশকে ভালো বেসে ফেলেছিলেন। জোসেফ ইম্যানুয়েল

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?

আসলে ভারতীয় ছিলেন । নিজের পরিচয় আড়াল করে তিনি ডোনাল্ডসের শিষ্য, নতুন ধর্ম আর নামের গর্বে উদ্ধত । কিন্তু দুষ্টু ছেলের দল তার ডোঙা সাঁওতাল নামটি ভুলে যায়নি । তারা 'ডোঙা - ডোঙা - ঢোঙা - ঢোঁঙা ' চিৎকার করে তাকে আঘাত করত । অন্যদিকে পাদ্রী হ্যানস ম্যাকস্ মুলারের গ্রন্থ পড়ে ভারতকে ভালোবেসেছিলেন বলে পাদ্রীর পোষাক পরেও ভারতকে একান্ত আপন করে তুলেছিলেন । বৃদ্ধ ডোনাল্ডসের সারা জীবনের চেষ্টায় যা হয়নি, জোসেফ ইম্যানুয়েল যা করতেপারে নি, হ্যানস তা করে মিশনারীদের উদ্দেশ্য থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছিলেন । আসলে এ দেশকে মূর্তিপূজার অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত করবার জন্যে মিশনারীরা এসেছিলেন, কিন্তু হ্যানস ধর্মপ্রচারে বের হয়ে ছেলেদের সঙ্গে কাদায় নেমে মাছ ধরেছেন, খাবারের দোকানে তেলেভাজা জিনিষ কিনে খেয়েছেন, কিম্বা কারো হাত থেকে হুঁকো তুলে নিয়ে টান দিয়েছেন ।তাই পাদ্রী ডোনাল্ডস তাঁকে গির্জায় স্থান দিলেন না । কিন্তু হ্যানস বহিষ্কৃত হয়ে বুড়ো বটতলায় গিয়ে শিব সেজে শিবের গাজনে নাচতে থাকেন । কিন্তু সেই অবস্থাতেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিনি হলেন বন্দী । কারণ ভারতবর্ষ আর জার্মানীতে তখন যুদ্ধ বেঁধেছে এবং হ্যানস জার্মান । অথচ যুদ্ধ জয়ের জন্য পঞ্চ কালীপুজো হচ্ছিল । ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা । এই দৃশ্য দেখে হ্যানস বন্দী অবস্থায় যে গাড়িতে ছিলেন সেই গাড়ির এক পূজার কাছ থেকে জলের গ্লাস চেয়ে নিয়ে ছুঁড়ে

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	মারেন কালী মূর্তির দিকে । মূর্তির মাথা তাতে চূর্ণ হয়ে যায় । হ্যানস ভারতবর্ষকে ভালোবেসে ছিলেন, কিন্তু প্রতিদানে কিছুই পাননি । তাই এই [illegible] দুর্ব্যবহার করে একজন [illegible] সত্যিকারের শত্রুতে পরিণত হয়েছেন ।	চরিত্রপ্রধান
ইতিহাস	ঐতিহাসিকের সত্যসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে গৌড়বঙ্গের অতীত ইতিহাস লিখছেন অমরেশ । শশাঙ্ক, নরেন্দ্রাদিত্যের অজেয় কাহিনী, কোটিবর্ষ, পৌণ্ড্রবর্ধন, মহাস্থানের ঐতিহাসিক বর্ণনা, কলিঙ্গের যুদ্ধে মেদিনীপুরের বাঙালীর জীবনদান, তাম্রলিপ্তের সমুদ্রতট থেকে পদ্মার পরপারে বিক্রমপুরের ভোজ বর্মদেবের রাজধানী কিছুই বাদ পড়েনি তাঁর লেখায় । পুত্র লোকেশ বিপ্লবী। তাকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন ছিল অমরেশের । বোন প্রণতি লোকেশের বিপ্লবী কাজকর্মের কথা ভেবে শঙ্কিত হয় । কিন্তু একদিন ফলেন এঞ্জেলের মতোই লোকেশ পুলিশের গুলিতে মারা যায় । প্রণতি কাঁদে, কিন্তু অমরেশ আবার আশায় বুক বাঁধেন । কারণ অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনা করছেন তিনি । সেই ইতিহাসের কাছে পুত্র লোকেশের মৃত্যু একটি পদচিহ্নের মতো । এই পদচিহ্ন একদিন জ্বলজ্বল করে উঠেছিল জালিয়ানওয়ালায়, সেবাগ্রামে, কর্ণফুলির তীরে, বুড়ি বালামের অরণ্যে, মেদিনীপুরের রক্তাক্ত মাটিতে । তাই লোকেশের মৃত্যুর পর গ্রাম জুড়ে যখন ঝড় আর বন্যা আসে, গ্রামের নারীপুরুষ বৃদ্ধ, শিশু, ভদ্র, অভদ্র সবাই এসে আশ্রয় নেয় অমরেশের বাড়িতে. তখন এরই মধ্যে তাঁর ইতিহাসে হিংসা দ্বেষজর্জরিত বাংলার চরম সর্বনাশের পটভূমিতে সর্বজনীন ঐক্যের কথা লেখা হয়ে যায় । বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে এই সর্বজনীন ঐক্যই	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	কথা লেখা হয়ে যায়। বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে এই সর্বজনীন ঐক্যই একদিন স্বাধীনতার সূর্যোদয় ঘটাবে — তাঁর ইতিহাসে এই আশ্বাসই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।	
বনজ্যোৎস্না	স্বাধীনতা সংগ্রামী মহীতোষ ও অরবিন্দ পালিয়ে এসেছিল উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের জঙ্গলে। কিন্তু জলঢাকা পাড়ের ঘন শালবনের মধ্যে অরবিন্দকে হারিয়ে ক্ষিদে তেষ্টায় কাতর হয়ে পিপাসার্ত পশুর মতো মহীতোষ ছুটে এসেছিল জলঢাকার তীরে। ভুটানী বালিকা পিউকুমারী তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। পিউকুমারী পচাইয়ের দোকানের মালিক কুনবীরের [illegible] মেয়ে। পিউকুমারী মহীতোষকে কুনবীরের ঝোপড়ীতেই গোপনে আশ্রয় দেয়। কিন্তু একদিন কুনবীরের পচাইয়ের দোকানে কাঠের কারবারী বলদেও এসে ফেরারী আসামীকে বাড়িতে আশ্রয় দেবার জন্যে ভয় দেখায় পিউকুমারীকে। মহীতোষ আর পিউকুমারীর মধ্যে প্রেমের কুসুমটি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। বলদেওর আকস্মিক আবির্ভাবে তা ঝরে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। বিপন্ন মহীতোষ ও পিউকুমারী স্থির করে দুজনে মিলে সিকিমে চলে যাবে। কিন্তু দরকার -টাকা। পিউকুমারী একরাতের জন্যে বলদেওর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তিনশো টাকা সংগ্রহ করে ফিরে এসে দেখল মহীতোষ নেই, ততক্ষণে অরবিন্দ এসে জঙ্গলের মধ্য থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে গেছে আরেক নতুন আশ্রয়ে। পিউকুমারীর কাছে বনজ্যোৎস্নায় যে ভালোবাসা ধরা দিতে চেয়েছিল তা	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	তা দাবাগ্নিতে পরিণত হল । মহীতোষের প্রেমময়, বনদেওর কামনার আগুনেই তার আহুতি হবে ।	
হয়তো	বিবাহ বিচ্ছেদের দু'বছর পরও মঞ্জুশ্রীকে লাল পেড়ে গরদের শাড়ি আর সিঁথিতে সিঁদুর পরতে দেখে সুদেব আশ্চর্য হয়েছে । মঞ্জুশ্রী আর বিয়ে করেনি । কারণ সে জানে হিন্দুর বিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের । আদালত থেকে বিচ্ছেদের ছাড়পত্র নিলেও তা মন থেকে মুছে ফেলা যায় না । সুদেব ও বিয়ে করেনি । রেবা দত্তর সাথে সে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করলেও তার সাথে অন্য কোন সম্পর্ক হয়নি । তাছাড়া রেবার বিয়েও হয়েছে এক আর্মিম্যানের সাথে । মঞ্জুশ্রী তারকেশ্বরে গিয়েছিল তার বাবার নামে পুজো দিতে, পাণ্ডার খাতাতে সে সুদেবের (স্বামীর) নামেও পুজো দিয়েছে । ট্রেনে চলতে চলতেই সুদেব ভাবে নতুন করে দুজনে মিলে দু'বছর আগের ভুল শুধরে নেবে, কিন্তু ততক্ষণে মঞ্জুশ্রী শ্যাওড়াফুলি স্টেশনে নেমে পড়ে । সেখানেই সে চাকরী করে ।	ভাবপ্রধান
সেই মৃত্যুটা	কালভার্টের তলের কোল ঘেঁষে জলো ঘাসে ঢাকা এক টুকরো ছোট জমির ওপর মৃত্যুমুখী একটি গোরু দেখে অভাবগ্রস্ত সোনা মিঞা, চিন্তাহরণ নিজেদের জীবনেও মৃত্যুর আশংকা করে । দুঃসহ অভাবে শুধু গোরুটাই মরছে না, মরছে মৃত গোরুর চামড়া সংগ্রহকারী মুচিও । ঘরে খাবার ছিল না, তাই মুচি পরিবারের সবাইকে মরতে হয়েছে । গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে মুচি । চিন্তার জীবনে স্বপ্ন ছিল হাল গোরু হবে, দশ বিঘে জমি হবে । ঈদ্ এলেও ভালো গোস্ত, পোলাও, বিরিয়ানি, কাবাব এসব কিছুই জুটবে না সোনার ভাগ্যে । অথচ মাতব্বরা	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	খান, ভোটের সময় গ্রামে জীপ আসে, চলে যায়, পাঁচ কাঠা জমির প্রতিশ্রুতি শূন্যে মিলায় ।	
দোসর	প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমান এক যাত্রীর মুখে গল্পটি পরিবেশিত । কথক গল্পে তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী তুলে ধরেছেন । দেশছাড়া হয়ে তাঁর জীবনে দুর্দশা এসেছে অনেক । কলেরায় বউ মরেছে, ছেলে মিশেছে ডিফুজের দলে, মেয়ে নিরুদ্দেশ । উদ্বাস্তু হিসাবে এখানে ওখানে ঘুরে আসামের পাহাড়ের ঢালে বাসা বেঁধে জমিতে সোনা ফলালেন ভদ্রলোক । কিন্তু সরকারী নোটিশ ও পরে হাতি লেলিয়ে দিয়ে তাঁকে সেখান থেকে উৎখাত করা হল । ভদ্রলোক এলেন বাংলাদেশে । শহরের বাইরে কাশ, শন আর ইকড়ার জঙ্গল ভেঙে নদীর চড়ায় তিনি নতুন করে ফলালেন শাকসবজী । কিন্তু সেখানেও এক শুয়োরের আবির্ভাব হল । শত্রু হিসেবে নয়, দোসর হিসেবে । ক্রমে শুয়োরটির সাথে তাঁর আত্মিক যোগ স্থাপিত হল । কিন্তু খাস জমি পত্তনি নেননি বলে সেখান থেকেও ভদ্রলোককে উৎখাত করার চেষ্টা হয়েছিল । চেষ্টা হয়েছিল বুনো শুয়োরটাকে হত্যা করার । হঠাৎ এল পাহাড়ী নদীতে বান । ভদ্রলোক আর শুয়োর ভেসে গেলেন বানের জলে । কিন্তু আশ্চর্য - শুয়োরটি ভদ্রলোককে অচৈতন্য অবস্থায় টেনে ডাঙায় এনে কোথায় ভেসে গেছে ভদ্রলোক জ্ঞান ফিরে তা জানতেও পারলেন না । বিপন্ন মুহূর্তে দোসর হিসেবে শুয়োরটি নিজের জীবন দিয়ে ভদ্রলোককে বাঁচিয়েছে ।	ঘটনাপ্রধান ।

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
বিসর্জন	সুদাম আর তার বৌ তুলসী বাড়ির বহু দিনের আশ্রিতা বুড়িটির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাই তুলসী বাপের বাড়ি গেলে শিমুলতলীর বিশালাক্ষীর মন্দিরে নিয়ে যাবার নাম করে বুড়িকে রাতের অন্ধকারে নৌকোয় তুলে নিয়ে নদীর চড়ায় ফেলে রেখে সুদাম ফিরে আসছিল। একটু বাদেই জোয়ারের জলে বুড়ি ভেসে যেত। কিন্তু জলে একটা কুমীর ভেসে উঠলে সুদাম ছুটে গিয়ে বুড়িকে পুনরায় ডিঙিতে তুলে ফেরৎ নিয়ে আসে। বিসর্জন দিতে গিয়েও সুদাম বুড়িকে বিসর্জন দিতে পারেনি।	ঘটনাপ্রধান।
কালপুরুষ	বার্ষিক উৎসবের প্রথম পর্যায় শেষ হবার পর শুরু হবে বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান কালপুরুষ। কালপুরুষের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছিল সৌম্যেন লাহিড়ী। কিন্তু পথ দুর্ঘটনায় সে মারা যাওয়ায় নৃত্যনাট্যের ভাষ্যটি দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব পড়েছে গল্পের বক্তার উপর। এই ভাষ্যের মধ্য দিয়েই নাটকের বিষয়বস্তু উদঘাটিত হয়েছে।	ভাবপ্রধান
শৈব্যা	সংসারী, ধার্মিক, চরিত্রবান সামাজিক মানুষ রূপে পরিচিত রাধাকান্তর বাড়িতে আশ্রিতা বালবিধবা জ্ঞাতির মেয়ে নীরদার কাছ থেকে সন্তান লমনা করতে পারেন না বলে নীরদাকে রাধাকান্ত কাশীর পাণ্ডা মহাদেব তেওয়াড়ীর বাড়িতে রেখে আসেন। বাবা বিশ্বনাথের কাছে এসেও দুঃখ বেদনায় অভুক্ত নীরদা হরিশ্চন্দ্র ঘাটে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। জীউৎরাম	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	তাকে খাবার কিনে দিয়েছিল, কিন্তু চণ্ডাল পরিচয় পেয়ে সে ঐ খাবার প্রত্যাখ্যান করে। বাড়ি ফিরে এসে নীরদা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। মহাদেব তেওয়াড়ীর রেইস আদমীর ~~হুকুম~~ জীউৎরাম নীরদাকে পায়নি, কিন্তু একদিন তারই ছোঁয়ায় নীরদার কাশীপ্রাপ্তি হবে— মনে মনে একথা যখন জীউৎরামের চেতনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন কলকাতায় রাধাকান্তর বাড়িতে কথকতার আসরে পালা হচ্ছিল হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে রাজরানী শৈব্যার মিলন।	চরিত্রপ্রধান
টোপ	টেরাইয়ের প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্বে রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুর এন.আর.রায়চৌধুরীর আদিম হিংস্রতার বলি হয়েছে তাঁর হান্টিং বাংলোর বেওয়ারিশ সম্পত্তি একটি কুলি শিশু। মানব শিশুর টোপ দিয়ে রাজা বাহাদুর তাঁর বাঘ শিকারের হিংস্র নেশা চরিতার্থ করেন।	চরিত্রপ্রধান
অপঘাত	পুলিশ ইনস্পেকটার সঞ্জীব বেথুন কলেজের ছাত্রী রূপসী নমিতাকে বাসে বসে থাকতে দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে রোজ তাকায়। একদিন কলেজ স্কোয়ারে মিছিলের মধ্যে নমিতাকে দেখে সঞ্জীব তার ভেতরে আবিষ্কার করে বিপ্লবের আদর্শ। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন সত্যশরণ বাবুর (নমিতার বাবার) বাড়িতে সত্যশরণ বাবু ও নমিতার আদর্শবিহীন বিনম্র মূর্তি দেখে সঞ্জীব তাঁদের মনে করে আদর্শচ্যুত।	চরিত্রপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর
ইজ্জৎ	ফকিরের সমাধি আর ডাকাতে কালীর থান নিয়ে মুসলমান পাড়ার ধনাম-ভাই আর নমঃশূদ্র পাড়ার জগন্নাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ও উত্তেজনা সংঘর্ষের মুখোমুখি। কিন্তু ধনাম-ভাই ও জগন্নাথ ঠাকুর বাড়িতে একই সংকটে আক্রান্ত। দুজনেরই ঘরের বউ কাপড়ের অভাবে ইজ্জৎ রক্ষা করতে পারছে না। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার ও ফুড কমিটির সভাপতি হাবিব মিঞার কাছে কাপড় চাইতে গিয়েও নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছে ধনাম-ভাই। পথে ম-ভাইর সঙ্গে দেখা হয় জগন্নাথের। ম-ভাইর কথা শুনে জগন্নাথও হাবিব মিঞার কাছে না গিয়ে ফিরে আসে। এদিকে দুপক্ষ সংঘর্ষের মুখোমুখি। কিন্তু রাতে দেখা গেল হাবিব মিঞার নানবিবির মৃত্যুর পর তার কবর খুঁড়ে কাফনের কাপড় সংগ্রহ করছে ম-ভাই আর জগন্নাথ দুজনেই।	ঘটনাপ্রধান
বন্দুক	জমির ভাগ নিয়ে গ্রামের চাষীদের সাথে জোতদার মহাজনদের বিরোধ চরমে উঠলে জোতদার লোকনাথ সাহা, ফজল আলী, নূর মামুদ আর বৃন্দাবন পাল রঘুরাম তাড়িওয়ালার হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে কৃষকদের নেতা রহমানকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু রঘুরাম কৌশলে তাঁদের চারজনের বাড়ি থেকে বন্দুক নিয়ে এসে তুলে দেয় রহমানেরই হাতে।	ঘটনাপ্রধান।

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
শিল্পী	কেয়া আর শ্বেত পদ্মে ভরা উড়িষ্যার গ্রামে শিল্পী সনাতন দিনরাত ছবি আঁকত । ক্ষেত, জমি আর সংসারের দিকে তার দৃষ্টি ছিল না । বুড়ো বাপ তাই তাকে গালি দিত । রাগ করে সনাতন একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যায় । বাপের মৃত্যুর পর সনাতন বাড়ি ফেরে, বিয়ে করে । কিন্তু বৌ সনাতনের ছবি আঁকার সাথে বাদ সাধে । সনাতন রাগে বউয়ের মাথায় এক ঘা ডান্ডা বসিয়ে দেয় । শ্বশুর তাকে পুলিশে দেয়, ছাড়িয়েও আনে । কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে সনাতন আর ছবি আঁকেনা । শিল্পী সনাতনের যেন মৃত্যু হল । সনাতন হল চাষী । কিন্তু ঝড়ে সমুদ্রের বালি এসে শস্যের জমি গ্রাস করে নিলে নিরুপায় সনাতন ভুবনেশ্বর স্টেশনে পান্ডার দালালি কাজ নেয় ।	ঘটনাপ্রধান
*শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুন্ডু	* শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুন্ডুর শ্রাদ্ধবাসরে গল্পের বক্তা *শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভের জন্ম, বংশ পরিচয়, বিদ্যাচর্চা, ব্যবসায়ে পারদর্শিতা, বিবাহ, পিতা রাধাবল্লভের মৃত্যুর পরে অনুজ রামবল্লভের সাথে তার মতান্তর, মামলা প্রভৃতি সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন । তাছাড়া গণিকাপল্লীতে সর্বস্ব বিসর্জনকামী যুবকদের সুপথে আনার জন্যে তাঁর উদ্যোগ, বড়বাজারে কাপড়ের দোকান, চিনির কলে শ্রমিক বিক্ষোভ দমন সম্বন্ধে বক্তা আলোচনা করেছেন । এছাড়া পঞ্চাশের মন্বন্তরে গোপীবল্লভের ভূমিকা, নারী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতামত, কুন্ডুগ্রামের বৈষ্ণব তোষিণী সভার প্রতিষ্ঠা এবং বৃন্দাবনে গোপীবল্লভ-এর মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলে বক্তা *শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভের আত্মার শান্তিকামনা করেছেন ।	চরিত্রপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর
কালাবদর	সর্বনাশা নদী কালাবদরের মাঝি কফিলদ্দি প্রচণ্ড বাতাস আর জলগর্জনের মধ্য দিয়ে নৌকো করে পৌঁছে দেয় সোয়ারীদের নিরাপদ স্থানে । কিন্তু ঘনকৃষ্ণ মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে কালাবদরের ঢেউ দেখে কফিলদ্দির কলজের ভেতর ভয় চেপে ধরে । মহাজনের দেনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ডাকাতি করে সে মানুষ খুন করতে চেয়েছিল, কিন্তু কালাবদরের জলের প্রেতাত্মা তার মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ইবলিশকে শাসন করেছে বলেই সে তা পারল না ।	চরিত্রপ্রধান
উস্তাদ মেহের খাঁ	উস্তাদ মেহের খাঁ সেতার শিল্পী । কিন্তু নতুন যুগের মানুষের কাছে তার ভজন আর রাগরাগিণীর ঝঙ্কার ঢেউ তুলতে পারে না । এই কারণেই গীটার আর আধুনিক গান শুনে অভ্যস্ত শঙ্করের কাছে উস্তাদজীর দিল্লী আগ্রার মিঞা কি মল্লার আর বিলাসখানী টোড়ীর অনুরণন ভালো লাগে না । কিন্তু শঙ্করের স্ত্রী রমা লুকিয়ে লুকিয়ে উস্তাদজীর কাছে শেখে সেতার । একদিন উস্তাদ তাঁর প্রেমিকা প্যারি বাঈকে টোড়ী বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন । কিন্তু প্রেমের মূল্য সে দেয় নি । ফলে প্রেমিককে হতে হল দেওয়ানা । পিয়ারীকে পাননি উস্তাদ, কিন্তু পেয়েছেন বেটী রমাকে । তাই প্রাণখুলে সমস্ত সম্বল উজাড় করে দিতে চাইলেন তিনি । এদিকে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভুল বুঝে উস্তাদকে অপমানিত করে শঙ্কর চল্লিশ বছর পরে আবার তাঁকে দেওয়ানা করল । উস্তাদ দেওয়ানা হলেন ঠিকই, কিন্তু কন্যা প্রতিমা রমাকে তুলে দিতে চাইলেন তাঁর জীবনের শেষ অর্ঘ্য । এই কারণেই টোড়ী রাগিনীর পাঠ শেষ না করেও রমা সুন্দর সেতার শিখেছে। কিন্তু দাঙ্গাকলঙ্কিত কলকাতার বুকে গুণ্ডাদের হাতে উস্তাদের হল অপমৃত্যু ।	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর
বাইশে শ্রাবণ	বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিবস উদ্‌যাপনের জন্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। বরানগরের একটি দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের মেয়ে শকুন্তলার ওপরই বেশি দায়িত্ব পড়েছে। অনুষ্ঠানে শকুন্তলা 'রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু কল্পনা' নামক প্রবন্ধ পড়ে প্রশংসা পেয়েছে সকলের। কিন্তু অনুষ্ঠানের শেষে সভাপতির খাবার আর ট্যাক্সি ভাড়া দিতে গিয়ে যখন সে দেখে ব্যাগের কুড়ি টাকা নেই তখন বুঝতে পেরেছে তার ভাই অজিতই এই কাজ করেছে। নিরুপায় শকুন্তলা অবশেষে কমনরুমে ঢুকে বড়লোকের মেয়ে বেণু বোসের ব্যাগ থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে নিয়ে মান বাঁচায় আর মনে মনে সেই অপরাধের জন্যে দগ্ধ হয়।	ঘটনাপ্রধান
মর্গ	ঢাকা মেলের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় ডাক্তার মন্মথ চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গেল। এমন অবস্থায় তাঁর সুন্দরী স্ত্রী মমতা শহরের চালের কলে চাকরী পায়। মালিকের ছেলে অনিরুদ্ধ শহরের দুটো চালের কলেরই ম্যানেজার। কর্মচারী মমতার প্রতি তার লোভ। একদিন অফিস থেকে অনিরুদ্ধ মমতাকে নিয়ে মাঠের দিকে বেরিয়ে আসে। পথে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পড়ে তারা আশ্রয় নেয় একটা মর্গে। সেখানে পচামাংস আর ওষুধের তীব্র গন্ধের মধ্যে তিন ঘন্টা থাকবার পর অনিরুদ্ধ মমতার বাড়ি এসে তার স্বামী মন্মথর একরাশ মাংস জমে থাকা পিণ্ডাকার মুখ দেখে নিরাশ হয়ে গেছে। তার মনে হল যে হাতে সে মমতাকে ছুঁয়েছিল সেখানে ক্লেদবসা রক্তমাখা একরাশ পচা মাংস জড়িয়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে মমতাকে পাওয়া দূরের কথা অনিরুদ্ধ জীবনের নাগকাটা ঘরের এই জীবন্ত প্রেতিনীকে ছেড়ে অন্ধকারে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু চারিদিক থেকে মমতার তীব্র শানিত হাসি ভেসে আসে তার কানে।	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোনশ্রেণীর
তিমিরাভিসার	ডাক্তার প্রণবেশ যেখানে নিজের রক্ত দিয়ে জয়াবতীর মেয়ে সুনীলাকে বাঁচিয়েছে। সুনীলা সুস্থতা ফিরে পেয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে। আসলে জয়াবতী সুনীলা আর প্রণবেশের মেলামেশার পরিবর্তে অর্থোপার্জন করতে চেয়েছিল। তার বাড়িতে মল্লিক সাহেবের আনাগোনাও এই কারণেই। প্রণবেশ সুনীলাকে নগদ টাকা, গয়না, ঘড়ি কিছুই দেয় নি। প্রণবেশ এই খবর রাখে নি। একদিন সুনীলার হাতব্যাগ ট্যাক্সিতে পড়েছিল। প্রণবেশ সেটা দিতে এসে এসব কথাবার্তা শোনে। জয়াবতী প্রণবেশকে খদ্দের রূপে চেয়েছিল। সুনীলা চেয়েছিল তাকে জীবন সাথী করতে। কিন্তু তিমিরাভিসারে এসে সুনীলা দেখল নেশাগ্রস্ত প্রণবেশের ভেতরে তাকে গ্রহণ করার মতো শক্তি আর নেই।	চরিত্রপ্রধান
কালনেমি	স্বাধীন ভারতে চায়ের ব্যবসা সংকটজনক মনে করে অ্যাঞ্জেলা আর জনস্টন সাহেবের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তাই ধনরাজ গুরুংকে উস্‌কানী দিয়ে বাঙালী বাবুদের লেলিয়ে দিলেন অ্যাঞ্জেলা। ধনরাজের নেতৃত্বে কুলিরা এল বাঙালী বাবুদের আক্রমণ করতে। তাদের আক্রমণে ভাস্করবাবু হলেন আহত। তারপর ধনরাজ গুরুং কুলিদের নিয়ে অ্যাঞ্জেলার বাংলোই দখল করে নেয়। এমন কালনেমির লঙ্কা ভাগ।	ঘটনাপ্রধান
অধিকার	দেশ বিভাগের পর দলে দলে উদ্বাস্তুরা এসে উত্তরবাংলার সাপ বাঘ ভরা মরা মাটিতে ক্যাম্প করে রইল। তিনশো ক্যাম্পের দেড়হাজার মানুষ মরাভূমিতে ফলিয়েছে সোনার ফসল। হিমাংশু আর ক্যাম্পের	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্‌ শ্রেণীর ?
	ডাক্তার তাদের হয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। কিন্তু যতীনবাবু আর অনুকূল বাবুর মতো জোতদারেরা পাহাড়ীদের মধ্যে জাতিয়া তাড়ানোর বিষ ছড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পের সকলে মিলে সাতশ বিঘে পতিত জমি একযোগে দখল করতে নামে। যতীনবাবুর দল, পুলিশের গুলি কিছুই তাদের প্রতিরোধ করতে পারে নি। ফলে সাতশো বিঘে পতিত জমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করল ঢাকা, নেত্রকোনা এবং রংপুর প্রভৃতি ক্যাম্পের মানুষ।	
জন্মভূমি	জোতদার মাখন সাহাকে খুন করে মুকুন্দ চাকরের বেশে এসে কাজ নিয়েছে। মুকুন্দ মহানন্দার ওপার থেকে এপারে এসেছে। রঞ্জন তার মুখে শোনে মহানন্দার ওপারে তার গ্রামের গল্প, সুখ দুঃখের গল্প। কিন্তু একদিন পুলিশ এসে মুকুন্দকে ধরে নিয়ে যায়। মিথ্যে হয়ে যায় রঞ্জনের কাছে মুকুন্দর মুখে শোনা মহানন্দার ওপারের গ্রাম, দীঘিপালিখান, টুকটুকে বউয়ের গল্প। কিন্তু এই মুকুন্দর জীবনের মধ্য দিয়ে নিঃসম্বল খেতমজুরের চিরকালের স্বপ্নপুরী দেশ পরম সত্য হয়ে দেখা দেবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে - এই সত্যটি রঞ্জনের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।	ভাবপ্রধান
স্রোতবান	বাবার মৃত্যুর পর অসুস্থ মায়ের চেষ্টাতে সিদ্ধার্থ কলেজে পড়ে। মলিন তার বন্ধু। কিন্তু পরীক্ষা দিতে গিয়ে মলিন অসুস্থ হয়ে পড়ে। সিদ্ধার্থ পরীক্ষা দিয়েছে। আড়াই মাস পরে পরীক্ষার ফল বের হলে সিদ্ধার্থ দেখেন সে ইংরাজিতে দু' নম্বরের জন্য ফেল করেছে আর তার পেছনের গগলস্ পরা ছেলেটি বই খুলে পরীক্ষা	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোনশ্রেণীর ?
	দিয়ে পেয়েছে ডিস্টিংশান । নিঃস্বার্থ সরস্বতীর সেবক মন আশা করেনি, আশা করেছিল পরীক্ষা পাশের পর মায়ের দুঃখ দূর করবার জন্যে একটি চাকরী । কিন্তু তার সে স্বপ্ন সফল হল না।	ঘটনাপ্রধান
হাত	পাঞ্জাব মেলের ভয়াবহ অ্যাকসিডেন্টের পর এক ভদ্রলোক যন্ত্রণায় অসাড় শরীর নিয়ে একটি মেয়েলি হাতের স্পর্শে ব্যথা এবং যন্ত্রণার মধ্যেও অনুভব করলেন একটা নিষিদ্ধ উন্মাদনা । কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তিনি বুঝতে পারলেন সেটা তাঁর পাশের মৃত ভদ্রমহিলার কাটা হাত তখন তাঁর মনে হল এ যেন কোন পিশাচের হিমশীতল থাবা । তারপর থেকে ভদ্রলোক রাতে ঘুমোতে পারেন না । কারো হাতের স্পর্শ পেলেই সেই বীভৎস অভিজ্ঞতার কাহিনী তাঁর মনে পড়ে যায় ।	ভাবপ্রধান
ঘাসবন	আশীলের ওপারে ঘাসবনের ভেতরে ঘাটিয়ালের মেয়ে রুকনির রূপ দেখে মুগ্ধ শ্যামলাল প্রতিদিনই একবার করে তার সাথে প্রেমালাপ করে । শ্যামলাল রুকনিকে নিয়ে পালাতে চায় । কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার বাথান । ঘাটিয়ালের সঙ্গে শ্যামলালের বিরোধ, তবুও রুকনির বর আসবে জেনে দুসের খাঁটি ভয়সা ঘিয়ের জন্য ঘাটিয়াল শ্যামলালের দ্বারস্থ হয় । এদিকে শ্যামলালের কথায় রুকনি লাল শাড়ি পরে এসে দাঁড়ায় আশীলের ওপারে ঘাসবনে । এমন সময় শ্যামলালের সবচেয়ে বড় মোষটি ক্ষিপ্ত হয়ে শিঙের গুঁতোয় রুকনিকে মেরে ফেলে । ঘাসবনের ভেতরে যে উন্মুক্ত প্রেমের জন্ম হয়েছিল, ঘাসবনের ভেতরেই তা সিদ্ধ না হওয়ায় প্রতিহিংসার আগুনে সেই প্রেমের হত্যা করে শ্যামলাল ।	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	শ্রেণীকরণ
রিবন বাঁধা ভালুক	স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য ছেলেবেলায় তাঁর ছোটমামার সাথে উত্তরবঙ্গের একটি অখ্যাত রেল স্টেশনে এসে বড়বাবুর মেয়ের (আরতিদির) সাথে গল্পের বক্তা রেল লাইনের দু'পাশের প্রাকৃতিক শোভা দু চোখ ভরে দেখতেন। একদিন দুজনে মিলে সুবর্ণরেখা নদী দেখতে গিয়ে মহুয়াবনের ভেতরে ভালুকের তাড়া খায়। বাড়ি ফিরে আরতি তিনদিন ধরে জ্বরে প্রলাপ বকে। মনীশ সেনের সঙ্গে আরতির বিয়ের কথা হয়েছিল। কিন্তু ভালুকের তাড়া খেয়ে এসে বাড়ির নীচের আলমারির লাল রিবনবাঁধা ভালুককে শুধু ফোটোতে চাদর জড়ানো মনীশ সেনের মত। মনে হয়। এই কারণেই আরতি মনীশ সেনকে আর বিয়ে করতে চায় নি।	ভাবপ্রধান
কেয়া	বেলেঘাটায় গ্রাম সুবাদে এক কাকার বাড়িতে জয়ন্ত তার কাকার আঠারো বছরের মেয়ে কেয়াকে পড়াত। কেয়ার প্রতি তার ভালোবাসা জন্মেছিল। কিন্তু কেয়ার স্বার্থপর মায়ের লোভের জন্যই কেয়ার বাবা চুরির অপরাধে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়। জামিনের জন্য দরকার প'াঁচেক টাকা। নিরুপায় জয়ন্ত তার প্রাইভেটের ছাত্র তারাপদ মল্লিকের অপদার্থ ছেলে রামপদর কাছে ছুটে আসে টাকার জন্য। ঠিক হয় পরীক্ষার হলে রামপদর পরিবর্তে জয়ন্তই পরীক্ষায় বসবে। কিন্তু পরীক্ষার হলে জয়ন্ত ধরা পড়ল ইনভিজিলেটরের হাতে। সে কেয়ার বাবার জামিনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে এই পথ নিল, কিন্তু নিজেরই জামিনের জন্যে কাউকে পেলনা। না রামপদ না কেয়া।	চরিত্রপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
মধ্যস্থ	পরপর তিন স্ত্রীকে অবলীলায় ছেড়ে দিয়ে শঙ্করীকে রিফিউজী ক্যাম্প থেকে বিয়ে করে এনেছিল মানব চক্রবর্তী। পোশাকে ভদ্র হলেও মানব চক্রবর্তী আসলে নামজাদা জুয়াচোর। তারাপদ দাস নামে পরিচয় দিয়ে সে অবসর প্রাপ্ত নিরীহ স্কুল শিক্ষক করুণাময়কে আড়াইশ টাকার টিউশানি আর আমেরিকা ভ্রমণের লোভ দেখিয়ে কৌশলে তাঁর দামী জার্মান কলম এবং ত্রিশ টাকা আত্মসাৎ করতে চায়। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির দ্বারপ্রান্তে এসে যখন করুণাময়ের চশমাটা পড়ে ভেঙে যায় এবং করুণাময় অন্ধের মতো অসহায় ভাবে আর্ত চীৎকার করে ওঠেন তখন অসহ্য ক্ষোভে মানব চক্রবর্তী ছুটে এসে তাঁকে ফিরিয়ে দিল তাঁর কলম আর টাকা। সেইদিন থেকেই মানব চক্রবর্তী এই পথ ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে শঙ্করীর কাছে। স্থির করে জুয়াচুরির বদলে সে পনেরো টাকা পুঁজি নিয়ে ট্রেনে ফেরি করে বেড়াবে।	চরিত্রপ্রধান
উদ্বোধন	গুণ্ডা নিরাপদ কাঞ্জিলাল প্রতারণা করে বৃদ্ধ অখিল ঘোষকে ফাঁকি দিয়ে তাঁর ভাইঝি জ্যোৎস্নাকে প্রাইভেট পড়ানোর সুযোগে হাত করে নেয়। অখিল ঘোষকে সে তিনশ টাকা কাঠায় ভালো বাস্তু জমি কিনে দেবার লোভ দেখায়। নিরাপদের সহপাঠী জ্যোতির্ময় এই সর্বনাশের হাত থেকে অখিল ঘোষকে বাঁচাতে নিরাপদের উদ্দেশ্য জানিয়ে দেয়। নিরাপদ সেই খবর জানতে পেরে জ্যোতির্ময়ের ট্যাক্সি লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছুঁড়ে দেয়। তাতে জ্যোতির্ময় ও তার স্ত্রী দুজনেই আহত হয়। এই ঘটনায় হাস-পাতালে এসে জ্যোতির্ময়ের পায়ে লজ্জায় ঘৃণায় লুটিয়ে পড়ে জ্যোৎস্না। এরপরে নিরাপদ বুঝে নেয় জ্যোতির্ময়ের পাশে দ্বিতীয়বার দাঁড়াবার শক্তি তার নেই।	চরিত্রপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
উত্তর পুরুষ	অভাবের পীড়নে কুসুম ডাঙার হাটে বলদ বেচতে এসে পথভ্রান্ত মানিক সর্দার ও তার পনের বছরের ছেলে বলাই জঙ্গলের মধ্যে বাঘের সামনে পড়ে। নিরুপায় মানিক সর্দার আত্মরক্ষার তাগিদে বাঘের দিকে ছুঁড়ে দেয় বল্লম এবং পিঠের আড়ালে লুকিয়ে রাখে ভীরু ছেলে বলাইকে। সর্দার ভেবেছিল — বলাইয়ের ভেতরে পৌরুষ জাগেনি। ছেলেকে মেয়েমানুষের চেয়েও অধম মনে হয় তার। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই আহত বাঘ অসতর্ক মানিক সর্দারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তার হাতের বল্লম মাটিতে খসে পড়ে। মুহূর্তে বলাই সেই বল্লম হাতে তুলে নেয় এবং বাঘের দিকে সোজা ছুঁড়ে মারলে বাঘের হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ হয়ে যায়। পিতার আড়ালে এতদিন বলাইয়ের পৌরুষ ছিল চাপা - এই সুযোগে তার পনের বছরের পৌরুষ পেল প্রথম মুক্তি।	ঘটনাপ্রধান
খুনী	রাত চারটের সময় মেল ট্রেন পাস করবে জেনে প্রচণ্ড শীতের রাতে গেট রুদ্ধ করে লেভেলক্রসিংয়ের প্রতিহারী হাজারী নির্ভাবনায় তার ঘরে এসে ঘুমিয়েছে। রাত দেড়টায় ওভারকোট জড়ানো তিনজন বাঙালীবাবু (চ্যাটার্জী, ঘোষ ও মাইতি) গাড়ির হর্ণ বাজিয়ে তার ঘুম ভাঙায়। হাজারী জেগে গেট খুলে দেয়। কিন্তু কর্তব্যে অবহেলা, করাপশন, দেশাত্মবোধ আর গণসংযোগের বিষয় আলোচনা করতে করতে তারা আদর্শবাদীর ভান করেও হাজারীর ছোট ঘরে আশ্রয় নিয়ে রিয়াল স্কচের বোতল খুলে বসে। দোষ এড়াতে হাজারীকেও তারা খেতে বাধ্য করে। সাঁওতালী হাঁড়িয়ায়	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্‌শ্রেণীর
	অন্যান্য যাত্রী শখের নেশায় কিছুক্ষণ মাতামাতি করে ঘুমিয়ে পড়ে। ততক্ষণে বাঙালী বাবুরাও বিদায় নেয়। কিন্তু এরই মধ্যে গেটখোলা পেয়ে গরুর গাড়ি উঠে পড়ে লাইনে। মেল ট্রেন এসে গাড়োয়ান ও গাড়িকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে চলে যায়। রেল লাইনের পাশে পড়ে রয় যন্ত্রণাকাতর আহত বলদ দুটি। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে যাত্রী নিজেকেই খুনী মনে করে রক্তমাংস ছড়ানো লাইনের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।	চরিত্রপ্রধান
তিনসাঁঝা	অসাধারণ মেয়ে নীলা মিত্রর সাথে এয়ারফোর্সে চাকরিরত অসাধারণ সোমেন চৌধুরীর বিয়ের পর ব্যাঙ্গালোরে থাকাকালীন মেন্টাল ডিরেঞ্জমেন্টের জন্য সোমেনের চাকরী চলে যায়। তারপরে কলকাতায় এসে নিমতলা শ্মশান থেকে রবীন্দ্রনাথের দাহস্থলের মাটি এনে কপালে ফোঁটা দিয়ে সকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা অবধি সোমেন লিখত কবিতা। 'তিনসাঁঝা' তারই লেখা কাব্য। বাড়ির সবাই সোমেনকে পাগল ভাবলেও নীলার বিশ্বাস সোমেনের অসামান্য কবিতা একদিন বিশ্বসাহিত্যে বিপ্লব আনবে। ভবিষ্যতের সমালোচক হয়তো তার মধ্যে বোদলেয়ার ও জেমস জয়েসের চেয়েও বড় কারো সন্ধান পাবেন।	ভাবপ্রধান
মহলা	নাটকের নায়ক অভিমন্যু চৌধুরী জয়ন্তীকে নায়িকা করেছিল। প্রাণপণে চেষ্টাও বোর্ড রিহার্সালের সময় জয়ন্তী ভুল করে। কিন্তু অভিমন্যু জয়ন্তীকে তার জীবনের ও নায়িকা করবে প্রতিশ্রুতি দিলে সে অপূর্ব অভিনয় করে দর্শককে তাক লাগিয়ে দেয়।	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
	রেসের ঘোড়ার মতো জয়ন্তীকে নেশা ধরিয়ে দিয়ে কত হাসিল করে অভিমন্যু পারিশ্রমিকের টাকা হাতে তুলে দিতে গেল। কিন্তু জয়ন্তী তা গ্রহণ করেনি। সে চেয়েছিল অভিমন্যুকে, আর অভিমন্যু তাকে মঞ্চের নায়িকা হিসেবেই দেখেছিল। ব্যর্থ জয়ন্তী অভিমন্যুকে পেলনা ঠিকই, কিন্তু তার জীবনের এই সত্যিকারের ঘটনা এরপর থেকে তাকে স্টেজ ফ্রী করেছে।	ভাবপ্রধান
একটি চিঠি	খুকু ও তার ছেলেবেলার বন্ধু পুতুল খেলার জন্যে একটি টগরফুল গাছ লাগিয়েছিল। কিন্তু বন্ধুর বাবা বদলী হয়ে গেলে উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বন্ধুটি খুকুকে ভুলে গেল, কিন্তু খুকু ফুল গাছটিকে যত্ন করে তাকে মনে রাখে। বহুদিন পরে মার্কেন অফিসার হয়ে সেই বন্ধুটি ফিরে আসে। একদিন খুকুদের বাড়িতে এসে সে জানায় তার ক্লাস-মেটের সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। একথা শুনে খুকু যে দুটি ছোটমেয়েকে পুতুল খেলার জন্যে ফুল দেয় নি তাদেরকে ডেকে উজাড় করে ফুল দিয়েছে। খুকুর জীবনে পুতুল খেলার ফুল গাছ পুতুল খেলা ছাড়া আর কোন কাজেই লাগেনি।	ঘটনাপ্রধান
রেকর্ড	বৈঠকখানা মার্কেটের কাছেই চোরাবাজার থেকে কিনে আনা একখানা রেকর্ডের অদ্ভুত সুর, গান আর বাজনা রহস্য মধ্যে দোলা দিলেও গল্পের উত্তমপুরুষ, তাঁর স্ত্রী করুণা ও স্ত্রীর বান্ধবী আইভি বুঝে উঠতে পারেননি সেটির ভাষা। কিন্তু একজন ভূপর্যটক এসে বললেন - এই নিষিদ্ধ রেকর্ডটিতে আছে নাৎসী অধিকারের সময়ের মুক্তিযোদ্ধাদের গান। এর শিল্পীদের হিটলারের গোয়েন্দারা লিকুইডেট করেছে। তাদের এই কথাবার্তার	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	সময়েই রাস্তায় ছাত্রদের মিছিলে চলে গুলি, লাঠি, টিয়ার গ্যাস। এই যা খাওয়া মিছিল, বুদ্ধপূর্ণের বর্ষামাদল, নাগা পাহাড়ের ঢাক, মৌমাছের বাজনা, বালুঘাটের হাত কাঁপানো টিকারা আর পার্ক সার্কাস স্কোয়ারের বাঘের ডাক যেন একসঙ্গে মিলে বিদেশী নিষিদ্ধ রেকর্ডের সুরটিই স্পষ্ট করে তুলেছে।	ভাবপ্রধান
তিতির	জুলফিকার আর সুখলাল পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান দুই সীমান্তের দুই প্রতিহারী একঘেয়েমী কাটাতে মাঝে মাঝে কাছাকাছি এগিয়ে এসে পরস্পরের সুখ দুঃখের কথা বলে। দুজনেরই গ্রাম এক। গাঁয়ের মহাবীরধ্বজা, মসজিদ, কামতাপরসাদজীর বাড়ি, পীরের দরগা, মাঠ, শিবমন্দির, ঝুমঝুমিয়া নদী, বালির উপরে ঘুরে বেড়ানো চাষার দল, তিতিরের ডাক - এ সবের স্মৃতিতে ডুব রয় দুজনের মন। হোলি-মহরম-ঈদ-মুবারক আর দেওয়ালির আনন্দভরা গ্রামে আসে হাঙ্গামা, প্লেগ। বাধে দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমানে। বিনাশ হয় জুলফিকারের ঘরবাড়ি। রুস্তম আলীর কারণে তার বোন মরে গলায় দড়ি দিয়ে। সুখলালের ও ভাই, মামা মরে। জমি হয় কামতাপরসাদের খাস। দুজনেরই জীবনের ধারা এক। কিন্তু দুই সীমান্তের দুই প্রতিহারীর মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান রচনা করেছে মাঝখানের নো ম্যানস ল্যান্ডের লেখিয়ো সাপের বাস।	ঘটনাপ্রধান
শুভক্ষণ	বন্ধুর বিয়েতে পাশের বাড়ির একটি সুন্দরী মেয়েকে নিশীথ পছন্দ করে বসে। কিন্তু বিয়ের মাঝপথে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ায় লগ্নশেষ হওয়ার আধঘন্টা আগে পৌঁছালেও সে বিয়ে নিশীথ করতে	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?

করতে পারে নি। ততক্ষণে লগ্নভ্রষ্টা হওয়ার আশঙ্কায় মেয়ের বাবা গ্রামের এক অকর্মা ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দেন। অপদার্থ অকর্মণ্য স্বামীর সাথে সে পা টিপাকের পর কলকাতায় এসে ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। দুটো বাচ্চা ছিল, কিন্তু তারা ক্যাম্পেই কলেরায় মরে। তার শয়তান স্বামী একদিন কালীঘাটে যাওয়ার নাম করে তাকে একখানা বড় নীল রঙের মোটরে তুলে দেয়। তারপর পূর্ব কলকাতার এক হোটেলে পাপ ব্যবসার অভিযোগে হোটেল মালিক ও তিনটি মেয়েকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। কাগজে তাদের নাম ও পদবী দেখে নিশীথ কোর্টে এসে মুচলেকা হাতে মলিন মুখে মেয়েটি বেরিয়ে আসছে। বাড়ি ফিরে সারারাত ভেবে তার জীবনের শুভক্ষণে হারানো নায়িকাকে উদ্ধার করতে চায় নিশীথ। ঘটনাপ্রধান
জীবনের এই শুভ মুহূর্তটিকে জয় করে নিয়ে যার কাছে দেওয়া বিয়ের প্রতিশ্রুতি সে পালন করতে চায়। এই অনুভূতি থেকেই তার মনে হয়েছে স্বামী ও হোটেল মালিক তার জীবনে হঠাৎই এসে পড়েছিল এবং নতুন আর কেউ আসার আগেই তাকে সে কেষ্টধাধুটি রোডের টিনের ঘরে তুলে আনবে।

খুন বিয়ের তিন বছর পর ভবতোষের চাকরী চলে যায়। দেখা দেয় নার্ভাস ব্রেক ডাউন। স্ত্রী কিরণলেখা তার সিগারেট, খবরের কাগজ, ব্লেড আর সংসারের সমস্ত খরচ যুগিয়েও জীবন্মৃত ভবতোষকে স্বাভাবিক করে আনতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত চেঞ্জে এসে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ী বাড়িতে খুন নামার চরম মুহূর্তে ভবতোষের জড়তা ভাঙে। সেখানে কিরণলেখার প্রেমে ব্যর্থ রণজিৎও

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্‌ শ্রেণীর ?
	এসে সেই ধুসে তলিয়ে যেতে থাকে। কিরণলেখার তীব্র আকৃতি শুনেও রণজিৎ তাকে উদ্ধার করতে পারে নি। আশ্চর্য অমানুষিক শক্তিতে ভবতোষই সেদিন কিরণলেখাকে বাঁচিয়েছে, আর রণজিৎ তলিয়ে যায় নিশ্চেতনার গভীরে।	ভাবপ্রধান
কল্পদ্রুম	অমিতা শিবেনকে ভালোবাসলেও অমিতার বাবা মা এম.এস.সি. পাশ সুশ্রী চেহারার ও কারেন্ট ডিপার্টমেন্টের চাকুরে দীপঙ্করের সাথেই অমিতার বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু বিয়ের রাতে কারেন্টের শক খেয়ে দীপঙ্করের মৃত্যু হলে কর্তারা শিবেনকে বিবাহসভায় নিয়ে আসে। মালাবদল করতে গিয়ে শিবেন অমিতাকে মনে করেন দীপঙ্করের বিধবা। হাত থেকে মালা খসে পড়ে তার। অমিতাকে সে তাই বিয়ে করতে পারে নি।	ঘটনাপ্রধান
তাস	পুজোর ছুটিতে দার্জিলিংয়ের চা বাগানে অমূল্যর বাড়িতে বেড়াতে এসে নমিতা তাসের আসর বসিয়ে দেয়। অমূল্যর স্ত্রী রেখা ও নমিতার স্বামী অসিত তাতে যোগ দেয়। ক্রমে এই তাস খেলার আসরেই অসিত ও রেখা মনের দিক থেকে পরস্পরকে কাছে টেনে আনে। অসিতের প্রকৃতি প্রেমে রেখা আকৃষ্ট হয় এবং রেখার ছিমছাম কমনীয় শরীর অসিতের মন কেড়ে নেয়। একদিন অমূল্যর অনুপস্থিতিতে খেলা হল না। সেই অবসরে অসিত রেখাকে নিয়ে নির্জন পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে বেড়াতে এসে পাথরের ওপরে খুব কাছাকাছি বসে। কিন্তু পাহাড়ী নির্জনতায়, শালবনের অদিমতায় অসিতের কথায় ও সুরে রেখা ভয় পেয়ে বাড়ি ফিরে আসে এবং তাসগুলো পুড়িয়ে ফেলে। বাড়ি ফিরে লজ্জায় কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকে অসিত।	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
লজ্জা	শান্ত উদাসীন আত্মভোলা বিনয় দুর্গেশবাবুর মেয়ে উজ্জ্বলাকে পড়াতে গিয়ে বইয়ের পাতার গণ্ডীর বাইরে কখনো বেরিয়ে আসে নি । কিন্তু বিনয়ের মা উজ্জ্বলাকেই ঘরের বউ করতে চায় । দুর্গেশবাবুও তাতে একমত । বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলেও বিনয় বিয়েতে অস্বীকৃত হয় । এদিকে পাড়ার ছেলেরা মিলে বুড়ো একজনকে বর সাজিয়ে পথে সাজানো বরের গাড়ি আটকে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যার ফলে বিনয় বিয়ে করতে রাজী হন । কিন্তু উজ্জ্বলা অপমানিত বৃদ্ধ বরের কথা ভেবে লজ্জায় দুঃখে তিনতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে ।	ঘটনাপ্রধান
ইঁদুমিঞার মোরগ	বাড়িতে আত্মীয় এসেছে বলে খাসী মোরগটাকে ইঁদু মিঞা ধরতে চায় , কিন্তু আত্মরক্ষার তাগিদে মোরগটি পাগলের মতো তারই কোলে এসে আশ্রয় নেয় । সেই থেকে ইঁদু মোটিকে ভালোবাসে । দবিরুদ্দিন দফাদার , দারোগা দীনমহম্মদ , ইনসপেক্টার ইমতিয়াজ চৌধুরী মোরগটির জন্য লোভ করলেও তাদের কারো ভোগে সেটি লাগেনি । শেষ পর্যন্ত ইমতিয়াজ চৌধুরীর গাড়ী থেকে মোরগটি উড়ে পালিয়ে যায় এবং সোজা ছুটে আসে ইঁদু মিঞার বাড়িতে ।	চরিত্রপ্রধান
হরিণের রঙ	টি.বি.রোগাক্রান্ত অনিলের স্ত্রী স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য কলকাতার বাইরে আসে । নতুন জায়গায় এসে অনিলের বোন নন্দার যত্ন , শরতের রোদ , বাড়ির সামনের পুষ্প বাগান , লালমাটির পথ , শালবন , পাহাড় , টিলা আর ঘাসে ছাওয়া সবুজ মাঠে হরিণ চড়ে বেড়ানোর দৃশ্য দেখে জীবনের প্রতি তার আকাঙ্খা তীব্র হয়ে ওঠে । এছাড়া নন্দা ও রজতের ভালোবাসা , বিয়ে , তাদের	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
	ফুলশয্যার রাতের কথা কল্পনা করে তার ও ইচ্ছে হয় অনিলের মাঝে নূতন করে পুরনো দিনগুলিকে আবার ফিরে পেতে। কিন্তু ফুলশয্যার রাতের স্মৃতি, সানাইয়ের সুর, আকাশের মতো মৃদু নীলরঙের শাড়ী পরবার আকাঙ্খা আর সবুজ মাঠের ভেতর অজস্র হরিণের রঙ তার কাছে টিবির লাস্ট স্টেজে জীবনের আলেয়া রূপেই ধরা দিয়েছিল।	ভাবপ্রধান
গন্ধরাজ	বইয়ের ক্যানভাসার সুধাংশু চক্রবর্তী কলকাতা থেকে ময়ূরাক্ষী পারের বুজপুর গ্রামে এসে পতিতপাবন স্কুলের হেডমাস্টার নিশাকর সামন্তর দেখা পান নি। কিন্তু সেই স্কুলেরই শিক্ষক শশধর বাড়ুয্যের বাড়িতে আতিথেয়তা পেয়ে ধন্য হলেন। শশধর বাড়ুয্যের স্ত্রী কণা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সুধাংশুকে ফন্টু দা ও তাঁর স্ত্রীকে রত্না ভেবে অতীতের বানানো প্রসঙ্গ গুছিয়ে বলে সুধাংশুর কাছ থেকে কণা তার বোলপুরের ছোটবোন বুনুর ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য কুড়ি টাকা ফী চেয়ে নেয়। কিন্তু কোম্পানীর মালিকের কাছে এই কুড়ি টাকার হিসেব মেলাতে সুধাংশুর বাড়ির একমাসের রেশন বন্ধ হবে। তবু যে সুধাংশু নিজের কর্পোরেশনের স্কুলে পড়ার খরচ চালাতে পারে না, তিনি একজনের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফীয়ের ব্যবস্থা করে তৃপ্তি পেলেন। সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাই তিনি কাচের ফুলদানি থেকে কুড়ি টাকার চেয়ে বেশি দামী দুটো গন্ধরাজ চুরি করে এনেছিলেন।	চরিত্রপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
উন্মেষ	স্ত্রীর আত্মহত্যার পর নিরঞ্জনবাবুর সংসারে থাকে তার বারোবছরের মেয়ে গৌরী আর বৃদ্ধ চাকর বৃন্দাবন। কিন্তু গৌরী বেঁচে থেকেও প্রাণহীনা। জন্তুর মতো প্রাকৃতিক ভয়, প্রাকৃতিক দুঃখানুভূতি ভরা গৌরীর চেতনা শিশুর মতো অপরিণত। ডাক্তার বলেছিলেন এ নৃপেন রায়েরই কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত। শুনে নৃপেন রায় কুঁকড়ে যান। তারপর থেকে ভাবপ্রধান গৌরীর চেতনাকে নিষ্ঠুর হিংসার খোঁচায় জাগিয়ে তুলতে তিনি পাখি শিকার করেন, উড়ন্ত মথকে খুঁচিয়ে পিষে ফেলেন, বাগানে লাগান ক্যাকটাস। বাঘ আর গন্ধচূড় সাপকে পাশাপাশি খাঁচায় রেখে তাদের হিংস্রতার দৃশ্যে গৌরীর চেতনাকে জাগাতে চান। শেষ পর্যন্ত খাঁচায় অবশ্য বাঘ আর সাপকে লাঠির আঘাতে খোঁচা দিয়ে দিয়ে একটা প্রতিহিংসাশীল হিংস্র আনন্দ লাভ করে গৌরীর চেতনার উন্মেষ হল।	
দরজা	উদ্বাস্তু হয়ে দিদির কাছে আশ্রয় নিয়ে লালসাধক ভগ্নিপতির কবলে পড়ে একটি মেয়ে গর্ভবতী হয়েছিল। এই ঘটনায় দিদির সংসারে যখন তার স্থান হলনা তখন আত্মহত্যা সে করতে পারেনি। গলার হার বিক্রির টাকায় একটি গাড়ি ভাড়া করে সে দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কোথাও আশ্রয় পায় নি। কারণ আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনা ছিল তার দেহে স্পষ্ট। হাসপাতালের হাউস সার্জেনকে স্ত্রী বেডের জন্য অনুনয় করেও প্রত্যাখ্যাত হয়ে আড়ষ্ট দেহে তাকে ফিরে আসতে হয়। শেষ পর্যন্ত সোনায় রহমান নামে পরিচয় দিয়ে কোচম্যানই তাকে একটি মুসলমানী হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। তারপর জানল সে সোনায় রহমানেরই রোকেয়া বিবি। কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও যার	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	যার সামনে সব দরজাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, মুসলমানী হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে গোলাম রহমান তার নতুন শিশুর জন্যে এমনি করেই একটি দরজা খুলে দিয়েছিল ।	চরিত্রপ্রধান
নতুন গান	ব্যাকরণতীর্থ, গুরুট্রেনিং পাস করে, স্কুলে পণ্ডিতি করে রায় মহাশয় নামেন গয়নার নৌকোর ব্যবসায় । তিনি যাত্রীদের আনন্দ দানের জন্যে সংস্কৃত ছন্দের শ্লোক শুনিয়ে বাংলায় সেগুলি ব্যাখ্যা করতেন । উর্দু শিখে গাইতেন গজল । তারপর এল ভাষা আন্দোলন । হরতাল ছাত্র আন্দোলন - দাঙ্গা গোলাগুলিতে বারুদ ঠাসা হল শহর । গয়নার নৌকোয় রায় মশায় ধরেন উর্দু আর সংস্কৃত গান । সেদিন অন্য যাত্রীদের সাথে ছিল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা । রায় মশায় তাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইলেন বাংলা গান । দারোগা এসে বাধা দেয় । কিন্তু যাত্রীদের ঐক্যের সম্মুখে দারোগা দাঁড়াতে পারে নি । সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে খালের জল ধানখেত, রাত্রি ও আকাশ সব যেন অবিচ্ছিন্ন ঐকতানে পরিণত হল ।	ভাবপ্রধান
কলঙ্ক	আদিত্য ডাক্তারের স্ত্রী বীথি সুন্দরী, বিদুষী, গুণবতী, কিন্তু ভয়ংকর নিউরোটিক রোগে আক্রান্ত । বীথির তিক্ত ব্যবহারে দাম্পত্যজীবনে আদিত্য সুখী হতে পারে নি । পাশের ফ্ল্যাটে নিশিবাবুর স্ত্রীরূপে পরিচিতা খুকু দি বীথিকে পানের সঙ্গে কোকেন খাইয়ে টাকা শাড়ি, গয়না সব আত্মসাৎ করতে থাকলে আদিত্য তাকে ফ্ল্যাট থেকে বের করে দেন । এই ঘটনায় বীথি আদিত্যকেই দায়ী করে মেজেতে	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
	গড়াগড়ি দিয়ে বাঘিনীর মতো আঁচড়ে আঁচড়ে আদিত্যের মুখ রক্তাক্ত করে দেয়। কিন্তু হাসপাতালে তিনদিন ধরে বীথির শারীরিক যন্ত্রণা ও মূর্ছিত হওয়ার দৃশ্য দেখে চতুর্থদিন আদিত্য মাদ্রাজ মেলে করে ওয়ালটেয়ারে চলে যায়। সেখানে মেডিক্যাল কলেজের সহপাঠিনী দীপার সাথে তার দেখা হয়ে যায়। মানসিক বিক্ষেপ ভুলবার জন্যে আদিত্য তার সাথে কয়েকদিন সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ায় এবং সেখানেই সে বীথির আত্মহত্যার খবর পায়। একসঙ্গে আদিত্যের সাথে দীপাও ফিরে আসে কলকাতায়। লোকে জানল আদিত্য ও দীপার সম্পর্কই বীথির মৃত্যুর কারণ। কাজেই বীথির পরিবর্তে কলঙ্কিত হল দীপা।	ঘটনাপ্রধান
হাঁস	বন্ধু রজত আর চাকরকে নিয়ে বীরেশ্বর লালশির শিকারে আসে জলসা গ্রামে। বিল, টিলা, বুনো হাঁস আর আকাশ নিয়ে জলসা মাঝে মাঝে রূপ বদলায়। শিকারে পাকা হাত বীরেশ্বরের। ক্যাটকেটিয়া, দীঘলি, মরালি, জলপিপি, চীনে হাঁস শিকার করেও লালশির শিকারের নেশা তার তীব্র হয়ে ওঠে। যেমনি মনীষা মিত্র শোভনা চক্রবর্তী, সুরমা রায়কে আয়ত্ত করেও মঞ্জু দত্তকে পাবার আকাঙ্খায় তার মন ডুবে রয়। শেষ পর্যন্ত লালশির শিকারে গিয়ে ঘনবনে পথ হারিয়ে আলেয়ার আলো আর মঞ্জু দত্তর হাসির মতো লালশিরের ডাক শুনে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে বীরেশ্বর।	ভাবপ্রধান
পুরোনো	অ্যাডভোকেট সুখময় ছেলেবেলার দিনগুলো থেকে অনেক দূরে চলে এসে শত ব্যস্ততার মধ্যেও ছেলেমেয়েদের নিয়ে মায়ের কাছ থেকে রূপকথার রূপমালার গল্প শোনেন। তাঁর এই শিশুসুলভ আচরণে স্ত্রী শুচিতা বিরক্ত হন। একদিন সুখময় জ্বর নিয়ে কোর্ট থেকে বাড়ি –	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়েন। কিন্তু অসুস্থ ছেলের জন্য দুশ্চিন্তায় তাঁর মায়ের ঘুম এল না। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রতিমা এসে মাকে সুখময়ের শিয়রে বসে সস্নেহে কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন। আর মায়ের কোলে মাথা রেখে শিশুর মতো মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে সুখময় ঘুমিয়ে পড়েন। মাও মুখে এক টুকরো হাসি নিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তখন মনে হয় যেন পুরোনো মায়ের কোলে পুরোনো রূপকথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে আটবছরের ছেলেটি। মা ও ছেলের এই দৃশ্য দেখে অনধিকারিণীর মতো প্রতিমা নিঃশব্দে খাটের পাশ থেকে সরে আসেন।	ভাবপ্রধান
দক্ষিণান্ত	সিভিল ম্যারেজের পর ধীরাজ ও ঊর্মিলার দেড় বছরের বিবাহিত জীবনে প্রথম মাসটি বাদে আর কোনোদিনই সুখ আসে নি। বাবার চেক বইয়ের পাতা জাল করে টাকা চুরি করেছে ধীরাজ। কিন্তু বিচ্ছেদের তিনবছর পর হঠাৎ একদিন অন্ধকারে ট্রেনের কামরায় উঠে ঊর্মিলাকে দেখে ধীরাজ ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করার কথা ভাবে। কিন্তু ঊর্মিলা প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে দেয় ধীরাজের। ট্রেন মোগলসরাই স্টেশনে এলে ধীরাজ নেমে যায় প্ল্যাটফর্মে। মুহূর্তে ঊর্মিলা বুঝে নেয় - টয়লেটের জানলা ভেঙে ধীরাজ এসেছিল ডাকাতি করতে। তাই দক্ষিণা হিসাবে ঊর্মিলা তার গলার হার আর কঙ্কণ জোড়া ছুঁড়ে দেয় তার দিকে।	চরিত্রপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্‌গুণীর ?
একটি অমর রাত্রি	নীল দর্পণ নাটকের পাণ্ডুলিপি সাথে নিয়ে মেঘনা পাড়ি দিতে গিয়ে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র নৌকোর তলার পাটাতন খসে অতল সলিল গর্ভে ডুবে যাচ্ছিলেন। দেশের মানুষের চোখের জল আর বুকের রক্ত মিশিয়ে নাটকের পাণ্ডুলিপি লিখেছেন তিনি। তাই নিজের মৃত্যু হলেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে শিশুকে। নিরুপায় হয়ে তিনি অকবর মাঝিকে বললেন-নাটকের পাণ্ডুলিপিটি পাগড়ীর মতো মাথায় বেঁধে কোনো ডাকঘরে তাঁর নাম করে পৌঁছে দিতে, তাহলেই ডেপুটি বঙ্কিমের হাতে সেটি পৌঁছে যাবে। কিন্তু তখনই একখানা বড় নৌকো দেখা দিল মোহনায়। মাঝিরা উঠল আনন্দে চেঁচিয়ে। বেঁচে গেল নাটক ও নাট্যকার দুজনেই।	ঘটনাপ্রধান
প্রতিনায়ক	ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাবা বিয়ে দিতে চাইলে গল্পের নায়িকা নায়কের সঙ্গে পালাতে গিয়ে মাঝপথে ধরা পড়ে যায়। পরবর্তীতে নায়িকা অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তার এসে প্রথমে প্লুরিসি পরে যক্ষা ও শেষে ক্যানসার বলে সন্দেহ করে। কিন্তু অসুস্থতার সময় নায়িকার জীবনের প্রথম নায়ক এসে তার সাথে কথা বলে। মেয়েটি আত্মহত্যা করতে চায়। কিন্তু যখন তার স্বামী এসে জানায় তার এম.আর.সি.পি. বন্ধু বলেছেন রোগটা ক্যানসার নয়। তখনই নায়িকা আনন্দে আর্তনাদ করে এবং চোখ বুজে বালিশে এলিয়ে পড়ে। মেয়েটির স্বামী তাকে বাঁচাতে চায়। সেই দৃশ্য দেখে প্রথম নায়ক ভেবে নেয়। নায়িকার কাছে তার প্রয়োজন শেষ। তাই উদভ্রান্তের মতো বিদায় নিয়ে পথে নেমে যায় প্রথম নায়ক। কিন্তু ক্লান্ত শিথিল নিশ্চেতন অবসাদের মধ্যে ওর ডাক শুনে হয়তো সে অঙ্গীকার করতে পারবে না-একথাও সে ভেবে নেয়।	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
দায়মোচন	জিমন্যাস্টিকের খেলায় দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়ে ভূপেন তনুশ্রীর মন কেড়ে নেয়। তনুশ্রী ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে ভূপেনের হাতে তার আংটি পরিয়ে দেয়। কিন্তু ভূপেনের বাবা বাড়ি বদল করে অন্যত্র গেলে উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এরপর সৌরাংশুর সাথে তনুশ্রীর বিয়ে হয়। কিন্তু ভূপেনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার বারো বছর পর চন্দননগর থেকে ফিরছিল তনুশ্রী। পথে তার গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে মোটর মেকানিক ভূপেনই তা সারিয়ে দেয়। সেই দিনই দায়মোচনের জন্যে তনুশ্রীর দেওয়া সেই আংটি ফিরিয়ে দেয় ভূপেন। কিন্তু তনুশ্রী সেটিকে গাড়ির চাকায় পিষ্ট করে চলে যায়।	ঘটনাপ্রধান
মর্যাদা	হোস্টেলে এসে মাঝে মাঝেই জুতো সারিয়ে দিয়ে কমল নামে একটি মেয়েকে এক মুচি মনে মনে ভালো বেসে ফেলে। পুজোর ছুটিতে কমল পুরী যেতে চাইলে সেও আপ্রাণ চেষ্টা করে টাকা জমিয়ে পুরী যেতে চায়। কিন্তু একদিন কমল হোস্টেল থেকে মুচি বলে ডাকার পর মুচির আত্মসম্মানে লাগে আঘাত। সেইদিন থেকে সে জুতো সেলাই করল না। পরে জানা যায়, সে দেশে চলে গেছে।	চরিত্রপ্রধান
কালোকোটর	ফ্রেন সাহেবের পরিবর্তে তাঁর অফিসের বেয়ারা অবনীশ গরমের মধ্যেও কালোকোট, ট্রাউজার আর চশমা পরে রঙমহল থিয়েটারে এলে ভলান্টিয়াররা তাকে বসতে দেয় পেছনের সারিতে। নাটকে অবনীশ তার হারানো বোন ও তার ব্যক্তিজীবনের দৃশ্য দেখে মনে করে সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে তার সাথে নিষ্ঠুর	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	রসিকতা করছে । স্টেজের ওপর অবনীশের দ্বিতীয় আত্মা কালোমোটর দেখে আর্তনাদ করে ওঠে । নাটকের শেষেও অবনীশ দেখেন পেছন থেকে আর একটা মোটর ঠিক তাঁর দু'হাত পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ।	ভাবপ্রধান
নেতার জন্ম	ডাক্তার ব্যাটবিল আদর্শ বিসর্জন দিয়ে মেদিনীপুরের গ্রামে গরীব সদ্যবিধবার ডেলিভারী করাতে গিয়ে ঝুঁকি না নিয়ে তাঁর জীবন্ত শিশুকে কৌশলে হত্যা করেন, অন্য দিকে টাকার লোভে পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অবস্থাপন্ন রামদাস-বাবুর স্ত্রীর ডেলিভারী করানোর জন্য ছুটে যান । রামদাস-বাবু পুত্রলাভ করলেন, কিন্তু সে পুত্র চামচিকের মতো রুগ্ন । এমনি করে একদিকে ভিলেজ আন্দোলনের নেতার জন্ম অঙ্কুরেই হল বিনষ্ট, অন্যদিকে জন্ম নিল আর্মচেয়ার পলিটিশিয়ানের ।	চরিত্রপ্রধান
উর্বশী	টুণ্ডলা স্টেশনের ওয়েটিংরুমে রাধেশবাবুর সাত বছরের ছেলে টুটুলের সঙ্গে নাম করা স্টার সুরূপাদেবী মাথায় ঘোমটা টেনে রোমাঞ্চকর গল্প বলেছে । নিজের পরিচয় আড়াল করে সুরূপা সেদিন ছোটবেলায় হাজিগঞ্জের মেলায় হারিয়ে যাওয়া টুটুলের বড়দিরূপে নিজের কৃত্রিম পরিচয় দিয়েছিল । কিন্তু একটু বাদেই দিল্লী মেল এসে তাদের ক্ষণকালের এই বন্ধন ছিন্ন করে দেয় । টুটুলের বাবা রাধেশবাবু এত কাছে পেয়েও সুরূপা দেবীর সঙ্গে আলাপ করতে পারলেন না বলে আক্ষেপ করলেন । কিন্তু টুটুলের আহত মনের দিকে তাকিয়ে তিনিই বললেন — অমন নচ্ছার মেয়ে মানুষ তার দিদি হতে যাবে কোন দুঃখে ।	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
লালঘোড়া	গল্পের বক্তা যখন তেরো বছরের বালক তখন একদিন সুযোগ বুঝে তাদের আস্তাবলের পাশ থেকে লালঘোড়ার(লালুর) পিঠে সওয়ার হয়েছিলেন । তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি তাকে নিয়ে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে রাতে একটি কবরখানার মধ্যে ফেলে দেয় । কিন্তু সারারাত সেই কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে শেয়ালের লোলুপতা থেকে সে মনিব পুত্রকে বাঁচিয়েছে। পরদিন এই দৃশ্য দেখে ভুল বুঝে তাঁর বাবা ঘোড়াটিকে হত্যা করলেন ।	ভাবপ্রধান
শেষচূড়া	হার্ট অ্যাটাকের পর ডাক্তারের পরামর্শে স্পোর্টসম্যান ভূপেন সেন স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য আসেন গয়া জেলার আধ গ্রাম আধ শহর মত একটি স্থানে । সেখানে ডাক্তার ঘোষ ও তাঁর এম.এ পাশ মেয়ে এণাক্ষীর সাথে স্পোর্টস এর গল্প করে দিনগুলো তাঁর ভালোই কাটছিল ।কিন্তু প্রফেসার অরুণ দত্ত ও এণাক্ষীর মেলামেশা ভূপেন সেনের অসহ্য ঠেকে । অরুণ দত্ত ও এণাক্ষী একদিন স্কুটারে করে বেড়াতে এসে দুর্গা পাহাড়ের ছাতিম তলায় পাশাপাশি বসে । এই দৃশ্য দেখে ভূপেন সেন অতি কষ্টে তাদের ছাড়িয়ে দুর্গা পাহাড়ের শেষ চূড়ায় পৌঁছে আত্মতৃপ্তিতে হেসে ওঠেন । কিন্তু ক্লান্ত শরীরে বুকের যন্ত্রণায় তিনি মাটিতে শুয়ে পড়েন । সুদক্ষ ব্যাটসম্যানের মতো তিনি নিরানব্বই রাণ করে দেখতে পেলেন একটি পাখিকে যার মুখ এণাক্ষীরই মতো । প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুর্গা পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় উঠে ভূপেন সেন মৃত্যুর অন্ধকার সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন এইভাবেই ।	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
তমস্বিনী	স্ত্রীর সঙ্গে কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে একটি ভিক্ষুক বুড়িকে আধুলি দিতে গিয়ে অন্তুর মনে পড়ে যায় আড়িয়াল খাঁর পাশে তার গাঁয়ের পারুল কাকিমার মুখ । পারুল কাকিমার বাড়িতে আশ্রিতা তাঁর এক দূর সম্পর্কের বাল্যবিধবা বোনকে বলরাম-লাল তন্ত্রসাধনার ভৈরবী করায় সে সন্তানের জননী হয় । বলরাম-লাল শিষ্যবাড়ি গেলে সুযোগ বুঝে পারুল কাকিমা অন্তুর সঙ্গে চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন । তান্ত্রিক স্বামীর পুণ্য ফলই যেন তাঁকে পাপ পরিশোধের জন্য কালীঘাটের মন্দিরে ভিক্ষুকের বেশে এনে পৌঁছে দিয়েছে ।	ঘটনাপ্রধান
সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে ।	মন্মথবাবুর মেয়ে হিমানীকে বিয়ে করে বন্ধুদের সাথে রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে বেরিয়ে এসে রেস্তোরাঁয় ঢোকে অংশু । কিন্তু বন্ধুদের বিদায়ের পর এই নতুন জীবনের কথা ভেবে অংশু ও হিমানী দুজনেই চিন্তিত হয় । মেজাজী ব্যবসাদার অংশুর বাবা হয়তো এ বিয়ে সইতে পারবেন না । চাকুরী চলে যাবার ভয়ে হয়তো মন্মথবাবু ক্ষেপে উঠবেন । তাই চৌরঙ্গীর হোটেলে অংশুর বাসর রাত কাটানোর ইচ্ছেতে হিমানী রাজী হয়নি । সেইরাতের মতো অংশু হিমানীকে নৈহাটী লোকাল ট্রেনে তুলে দেয় । অনেক রাতে ট্রেন থেকে নেমে রিক্সায় যেতে যেতে হিমানী এই নতুন জীবনের বিশাল সমুদ্রের মতো ব্যাপ্তির মধ্যে নগ্নতা অনুভব করে । শাড়ীর আঁচল দিয়ে অংশুর হাতে টেনে দেওয়া সিঁথির সিঁদুর মুছে নেয় হিমানী । সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা যন্ত্রণায় তার মস্তিষ্কের স্নায়ু ভরে যায় ।	ভাবপ্রধান
কুয়াশা	কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাতে অকজিলিয়ারী হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন অমূল্য দত্তগুপ্ত বত্রিশ নম্বর বাংলোয় রায়চৌধুরী	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	গান শট ইনজুরির চিকিৎসা করতে যান । সেখানে মঞ্জু নামে একটি সুন্দরী মেয়ে রায়চৌধুরীর মিথ্যা মেয়ে সেজে অমূল্যর সহানুভূতি কেড়ে নেয় । বিদায় নেবার দিন রায়চৌধুরী ও মঞ্জু দুজনেই অমূল্যর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে । আড়াইবছর পর শিলিগুড়ি স্টেশনের ওয়েটিং রুমে মঞ্জুর সঙ্গে যখন অমূল্যর দেখা হল তখনই সে জানতে পারে যে মঞ্জু সেই রায়চৌধুরীকে ছেড়ে নতুন এক মাঝবয়েসী হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সঙ্গে চলে এসেছে । কারণ অমূল্যর কাছে মিথ্যা মেয়ে সাজবার পর রায়চৌধুরীর জীবনের ভুল ভেঙে গিয়েছিল এবং তখন থেকেই মঞ্জুকে তিনি মেয়ের মতো দেখতে থাকেন ।	ঘটনাপ্রধান
হলদে চিঠি	অনেক ইন্টারভিউর পর অনিন্দ খড়্গপুরে ইস্টার্ণ রেলওয়ের চাকরীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পেয়েছে । কিন্তু সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে নিয়ে ট্রামে বাসে কলকাতার চাকরীজীবী মানুষের যাতায়াতের দুর্দশা দেখে সে হতাশ হয়েছে । চাকরী পেয়ে অবসর জীবন যাপনের কদর্যরূপ সম্বন্ধেও সে অবহিত হয়েছে । বন্ধুদের কাছেও কেরাণী গিরির কোনো মূল্য নেই । অমরেশের গল্পে কেরাণী হরেনবাবুর দৃষ্টান্তে সে আরও হতাশ হয়েছে । তাছাড়া প্রেমিকা নমিতাও অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসের চাকরীর সম্ভাবনাময় শিলংটা ছেড়ে তার সাথে খড়্গপুরে যেতে রাজী নয় । এইভাবে চাকরী পাবার পরই যেন জীবনের সমস্ত ঘাটিগুলো তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে । অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ভরা অভিশপ্ত হলদে খামই যেন তার পৃথিবীকে কদর্য বিষাদে ভরে দেয় ।	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
সুখ	কবি তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী পাগলা চৌধুরী নামে উত্তরবঙ্গের এক পাড়াগাঁয়ে এসে ঘড়েল কার্সিং আর টোটকা চিকিৎসা করেই দিন কাটান। কবিতা ও প্রেমিকা তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এই জন্যেই তিনি শহর কলকাতা থেকে নিজেকে নির্বাসিত করে বোবা কালো কুৎসিত স্ত্রীকে নিয়ে সত্যিকারের সুখ খুঁজে নিয়েছেন গাঁয়েই। জীবনের সব কিছুকে তিনি পাথরের তলায় চাপা পড়ে থাকতে দিতে পারেন না। তাই সুকুমারের শ্বশুরবাড়ি ফেরার সময় তিনি পথে পাথরের চাঙার সরাতে চেষ্টা করেন। তুহিনাংশু আত্মহত্যা করতে চাননি। কিন্তু বোবা কালো কুরূপা স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর জীবন, অকারণে বিকেলের নদী পার হয়ে সন্ধ্যার বনতুলসী আর বেনুঘাসের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ও অন্ধকারে সাপের খোলস আঁতার অর্থ যেন তাঁর আত্মহত্যাকেই ঘোষণা করছে।	ভাবপ্রধান
ট্যাক্সি-ওয়ালা	ইংরেজীতে এম এ ফেল বামুনজাদা পরিবেশন-কারী সন্তোষ কেবল পরের জন্যে পরিবেশন করেই সন্তুষ্ট থেকেছে। নিজের জন্য কিছুই করবার অবকাশ তার জোটেনি। কেতকীকে সে ইংরেজী পড়াত, গান শেখাত, কিন্তু বিয়ের কথা সে মুখ ফুটে বলতে পারেনি। অনুতাম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেতকীর বিয়ের সময়ও পরিবেশন শিল্পী - সন্তোষ সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেনি। পরিবেশন করে এমনকি সাতপাকের সময় কনের পিঁড়ি ধরে ক্লান্ত সন্তোষ পরদিন হাওড়া স্টেশনে বরকনেকে বিদায় দিয়ে ট্যাক্সিতে ফিরছিল। কিন্তু খিদিরপুরের নাম করে ট্যাক্সিওয়ালা যখন ঝড়ের গতিতে ছুটে যাচ্ছিল ডায়মণ্ডহারবারের দিকে তখন সন্তোষের সন্দেহ জাগে। কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা জানায়, সারাদিন পরের জন্যে গাড়ি চালিয়ে	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	নিজের জন্যেও সে একটু চালিয়ে নিচ্ছে । বাড়ি পৌঁছুতে একটু দেরী হলেও ট্যাক্সিওয়ালার এই আচরণ সন্তোষের মনে দাগ কাটে ।	
ঘূর্ণি	ডাকিনী পদ্মা , মদের নেশা , সাথীদের আহ্বান আর মহাজনী নৌকোর লোভ সামলাতে না পেরে ডাকাত লালচাঁদ যমুনার নিষেধ তুচ্ছ করে পদ্মার বুকে ডাকাতি করে । যমুনার কথায় ছেলে হবার পর লালচাঁদ ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছিল । কিন্তু একদিন গভীর রাতে পদ্মা তার নাড়ী ধরে টান দেয় । যমুনার কাতর অনুনয়কে অবজ্ঞা করে লালচাঁদ পদ্মাবক্ষে চক্রবর্তীর নৌকোর সর্বস্ব লুট করে । তাকে চিনতে পারে বলেই সে রামদা দিয়ে চক্রবর্তীর মুণ্ডু নামিয়ে দেয় । বাড়ি ফিরে এসে লালচাঁদ দেখে ভেদবমি করে যমুনা মরে পড়ে আছে, ছেলেটা কাঁদছে দুধের জন্যে । এর পরেও লালচাঁদ মথুরা ঘোষের নৌকো আক্রমণ করে । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নৌকো পদ্মার ঘূর্ণিপাকে আটকে যায় । বিপন্ন মুহূর্তে মথুরা ও লালচাঁদ আঁকড়ে ধরে একটি ভাসমান নারকেল গাছ । পদ্মার দুরন্ত ঘূর্ণির টানে ডুবে যায় ডাকাত লালচাঁদ , কিন্তু মথুরা ঘোষ তার হাতের মুঠোতে ধরে থাকে শত্রু লালচাঁদেরই দেওয়া গেঁজেটা । লালচাঁদ সেটিকে তার রতন গজেনের পিসির বাড়িতে ছেলের কাছে পৌঁছে দিতে বলেছিল । কারণ তার স্বপ্ন ছিল ঐ গেঁজের মোহর দিয়ে ছেলের নামে জমি কেনা হবে , চাষী হয়ে ছেলে খাবে নিজের রোজগারের ফসল ।	চরিত্র-প্রধান
ধানশ্রী	সুধাকর আর মকবুল কেরায়া নৌকোর মাঝি । আঠারো বছর বয়সে সুধাকরের জীবনে এসেছিল রায় মহলের ছোটকর্তার রক্ষিতা কমলিকে পাবার সুযোগ । পাঁচকুড়ি টাকার অভাবে মকবুল ও	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
	রোকেয়াকে পায়নি। টাকা আর ধানের জমির লোভ দেখিয়ে রোকেয়াকে বিয়ে করে নেয় ইদরিশ মিঞা। অনেক দিন পর চণ্ডীকীর্তনের আসরে রাধাকে দেখতে পেয়ে একরাতে আমগাছের তলা থেকে তাকে ধরে এনে সে নৌকোয় তোলে। সঙ্গে ছিল মকবুল। নতুন চর পত্তনি নিয়ে ফসল ফলিয়ে ঘর বাঁধবে সুখাকর। কিন্তু নৌকোয় যেতে যেতে মকবুল হঠাৎ জলে ঝাঁপ দিয়ে নেমে যায়। কারণ আরেকবার সে চেষ্টা করে দেখবে রোকেয়াকে ফিরে পেতে পারে কিনা।	ঘটনাপ্রধান
সীমান্ত	বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে দয়াল মণ্ডল মারা যায়, কিন্তু তার বন্ধু ফজলে রব্বি হাঁটুতে গুলি খেয়েও বেঁচে থাকে। মরবার আগে দয়াল মণ্ডল তার মেয়ে কুসুমনির দায়িত্ব ফজলে রব্বিকেই দিয়ে যায়। কাওরামের সঙ্গে ফজলে কুসুমনির বিয়ে দেয়। বিয়ের পর কাওরাম চলে আসে হিন্দুস্থানে। মকবুল এসে খবর দেয় কাওরাম খুন করে জেল খাটছে। কুসুমনি করছে উপোস। একথা জেনে ফজলে রব্বি তার ছেলে তাহেরকে বলেছিল- আধ মন চাল কুসুমনিকে পৌঁছে দিয়ে আসতে। তাহের রাজী হয়নি। তাই বৃদ্ধ ফজলে রব্বি নিজেই কাঁধে আধ মন চালের বোঝা নিয়ে সীমান্তের নদী পার হওয়ার জন্যে আঘাটায় নামে। কিন্তু কড়া টর্চের আলোয় সে ধরা পড়ে যায় এবং লাঠির আঘাতে তার চালের বস্তা পড়ে যায় জলে। অন্ধকার স্রোতে ভেসে যায় ফজলে রব্বির চেতনা। কাওরাম আট মাস আগে পাকিস্তানে পালিয়ে এসেছিল। ফজলে জানতে পারেনি লাঠির ঘা কাওরামই মেরেছিল।	ঘটনা-প্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
মশা	শ্যামপুকুর স্ট্রীট থেকে উত্তর - পূর্ব কলকাতার উপনগরী অঞ্চলে এসেও অপূর্ব শান্তাকে ভোলেনি। একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রাম রাস্তার মুখে শান্তার সঙ্গে দেখা হয় অপূর্বর। অপূর্ব শান্তাকে নিয়ে ঢোকে কোনড্রিঙ্কসের দোকানে। কিন্তু দুজনের অভাব পীড়িত পারিবারিক জীবন, কলকাতার বিশ্রী গরম। মশার উপদ্রব - এইসব আলোচনা করতে করতে আসল কথাটি অপূর্ব আর শান্তাকে বলতে পারেনি।	ভাবপ্রধান
দিনান্ত	স্ত্রীর মৃত্যুর দশ বছর পর ছেলের জন্যে পাত্রী খুঁজতে গিয়ে গোকুল মণ্ডল মেয়ে পছন্দ করে নিজেই বিয়ে করে বসেন। এই ঘটনায় তাঁর মেয়ে অমিতা আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করতে চায়। ডাক্তার ও অন্যান্যদের চেষ্টায় সে বেঁচে উঠলেও আফিংয়ের নেশাতে কেবলই ঘুমোতে চায়। বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসে অমিতার এই বিপজ্জনক অবস্থা দেখে হিমাংশু তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করার মানসিক প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু বাবার মতের বিরুদ্ধে সে অসবর্ণ বিবাহ করতে পারেনি। এদিকে অমিতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। এগারো বছর পর হিমাংশু অমিতাকে আবিষ্কার করে কলেজের প্রিন্সিপাল অজয় রায় চৌধুরীর স্ত্রী রূপে। হিমাংশু যে কলেজে কেরাণী নয় - টাইপিস্টমেই কলেজেরই প্রিন্সিপালের স্ত্রী-রূপে অমিতাকে দেখে যন্ত্রণা পাগল হিমাংশু আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
সোনালী বাঘ	যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-বস্ত্র সংকটের দিনে সোনাঝুরি চা বাগানের ম্যানেজার মোহিনী সরকার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের আদেশ অমান্য করে বাগানের কুলিদের বঞ্চিত করে চাল-ডাল-জামা কাপড় সব আত্মসাৎ করে নেয়। পরিদর্শনে এসে ডিরেক্টারও দেখে যান কুলিদের দুর্দশার চিত্র। বাগানের বারো আনা শেয়ারের মালিক ঝুনঝুনওয়ালা কলকাতায় থেকে এ খবর রাখে না। অথচ ম্যানেজার মোহিনী সরকারের বাড়িতে স্ত্রী অমলা ও মানভূমের শালবনের ছায়া আর লালমাটির টিলা থেকে আমদানী করা মেয়ে আয়ার চলে প্রসাধনের প্রতিযোগিতা, এরোড্রামের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী পাঞ্জাবী শিখের আসর বসে। এদিকে জরুরী টেলিগ্রামে মোহিনী খবর পায় ঝুনঝুনওয়ালাদের জামাই শঙ্কর লাল গৌহাটি থেকে পরদিন আসছেন বাগান পরিদর্শনে। কাগজপত্র, গুদাম সাজানো, অতিরিক্ত তিনশো বস্তা চা পাতা নিরাপদ স্থানে সরানো — এই চিন্তায় অধীর হয়ে মোহিনী সেই আসর ছেড়ে চলে আসে অফিসে। এদিকে বারোটায় কুলি বস্তিতে দারুণ চীৎকার, কোলাহল, কান্না। বাঘ এসে মংরাকে খাটিয়া থেকে তুলে নিয়ে গেছে। মোহিনী বন্দুক আনতে বাংলার দিকে গিয়ে দেখল তার নিজের ঘরেও ঢুকেছে বাঘ। কিন্তু সে বাঘ পশু নয়, মানুষ। শিখকে নিয়ে তার স্ত্রী অমলা আর পাঞ্জাবীকে নিয়ে আয়া ঘর বন্ধ করে আছে। পাহাড়ের রাজত্ব থেকে ক্ষুধার্ত বাঘ কুলি বস্তিতে, বাঘ মোহিনীর বাড়িতে।	চরিত্রপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্‌শ্রেণীর ?
মারীচ	রতন সিংয়ের প্ররোচনায় ন' হাজার টাকা আয় করতে গিয়ে বিড়িপাতার ব্যবসা ছেড়ে কুশলদাস হল পাহাড়ী নদীর বাঁধ তৈরীর কাজে গোবিন্দরামের সাব কন্ট্রাক্টর। রতন সিং কুশল দাসকে সাবকন্ট্রাক্টের কাজে পুরোপুরি নামাতে তার মেয়ে বাসমতীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। কুশল দাস টের পেয়েও প্রতিশোধ নিতে পারেনি। কারণ বাঁধ, স্টোনক্রাশার, গোবিন্দরাম - এ সবের কাছ থেকে তার মুক্তি নেই।	চরিত্রপ্রধান
চক্রব্যূহ	জেলখানার প্রাচীর টপকে অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করে সোনাডাঙার বাঞ্ছা হাড়ি নিস্তারিণ লোহারের কামারশালায় গিয়ে পায়ের বেড়ী খুলে নেয়। কিন্তু দেড় বছরে বাংলা দেশের ভাগ্যে যে বিপর্যয় নেমেছে সেকথা জেলে থেকে বাঞ্ছা টের পায় নি। এইজন্যই নিস্তারিণ তাকে বলেছিল - জেলে থাকলেই সে ভালো করত। দেড়বছর বাদে গাঁয়ে ফিরবে বাঞ্ছা। কতদিন সে মন্দীকে দেখেনি! মন্দী বাঞ্ছার বউ। কিন্তু একদিন একরাতের পথ অতিক্রম করতে করতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাংলার বীভৎসরূপ দেখে সে ভয় পেয়ে যায়। তবুও অনেক আশা নিয়ে বাঞ্ছা গ্রামে ফিরল। কিন্তু তার শ্যালক বদন চৌকিদারের বাড়িতে মন্দীকে সে কোন্ বেশে দেখতে পেল! মন্দী মিলিটারীদের গণিকা, দুর্ভিক্ষের দিনে বদনের উপজীবিকা। নিস্তারিণ লোহারের কথাই বাঞ্ছার মনে পড়ল। জেলের বাইরেও চারদিকের পৃথিবী জেলখানার চেয়েও যেন সংকীর্ণ হয়ে এল তার কাছে। এরচেয়ে থানায় ধরা দিয়ে যাবজ্জীবন এমনকি দ্বীপান্তরে যাওয়ার শাস্তিও মাথা পেতে নেওয়া তার পক্ষে অনেক ভালো।	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
সপ্তপদী	অজিতের স্ত্রী মঞ্জরীর দুটো পা কাটা । এতে ভর দিয়ে চলে ওর গলির পথে চলমান মানুষের পায়ে রঙবেরঙের জুতো দেখে মনে মনে কষ্ট পায় । পাশের বাড়ির জগপতি দর্জির কলের শব্দ আর নির্জন আকাশের চিলের ডাক শুনে তার দিন কাটে । দারিদ্র্যের জন্য অজিতকে সে সাহায্য করতে চায় । জগপতি দর্জির মৃত্যুর পর তার স্ত্রী দেখেন হাসি যখন শোক ভুলে গিয়ে সেলাইয়ের কাজ নেয় তখন মঞ্জরীও বাড়ি বদলের সিদ্ধান্ত পালটে দেখেন হাসির সাথে সেলাইয়ের কাজে যোগ দেয় । অজিত মঞ্জরীর এই মানসিক পরিবর্তনে খুশী হয় ।	ঘটনাপ্রধান
বারো মরিকের বিল	দেড়শো বছরের সুরবাধা বারোমরিকের বিলের প্রশান্ত জীবনে এতটুকু পরিবর্তন গঙ্গাধর ঘোষ মেনে নিতে পারে নি। তাই রামহরি ঘোষের কলেজে পড়া ছেলে নীলমাধব যখন তাকে বিলে বাঁধ দিয়ে ধান ছড়িয়ে দেবার প্রস্তাব দিয়েছে তখন সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে । এদিকে মহামারী, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মহাজনের শোষণ পীড়িত বাংলায় দুর্ভিক্ষ প্রকট হয়ে ওঠে । মানুষের কঙ্কালে ভরে যায় বারোমরিকের বিল। গরু বাছুরও মরতে লাগল । গঙ্গাধর ঘোষের শেষ আশ্রয় দুধেল গাইটিও মরে যায় । গঙ্গাধর সেটাকে ভাগাড়ে টেনে নিয়ে যেতে যেতে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে মাটিতে বসে পড়ে । পথে ফকির ঘোষ তার অসহায় অবস্থা দেখে তার সংগৃহীত দুসের ধানের একসের দেয় গঙ্গাধরকে । গঙ্গাধর ধান কোমরে	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্‌শ্রেণীর ?
	বেঁধে অতি কষ্টে রাজীর মৃত শরীরটাকে টানতে টানতে মাথা ঘুরে বিলের কাদায় মুখে রক্ত তুলে মরে পড়ে থাকে। কিছুদিন বাদে গাঁয়ের লোক দেখে গদাধরের মৃতদেহের স্থানে নরম কাদার মধ্য থেকে একগুচ্ছ শীষ উঠেছে, ধানের শীষ। তার মৃত্যুতেই বারো মল্লিকের বিলের সোনালী সম্ভাবনা ধরা পড়ে যায় সকলের চোখে। এই ভাবেই বারো মল্লিকের বিলের অভিশপ্ত জীবন ঘুচে পৃথিবীর বুক থেকে সোনা তুলে আনার পথ তৈরী হয়ে যায় - বারোশো কোদালের ঘায়ে যেন তারই সংকেত।	ঘটনাপ্রধান
জান্তব	তরাইয়ের পাহাড়ী মানুষের কাছে গুম্ফা লামা এক দুর্বোধ্য রহস্য ও ভয়। তার আবির্ভাবেই কোনো অমঙ্গলের আশঙ্কা জাগে। এই গুম্ফালামা বিশ্বাসঘাতিনী পত্নী মাইলির কাছে উপেক্ষিত হয়ে তরাইয়ের পার্বত্যপ্রদেশের এক গুহায় আশ্রয় নেয়। সঙ্গী তার কুকুর নান্দু। কিন্তু তুষারমণ্ডিত পাহাড়ী অরণ্যের জান্তব প্রাকৃতিক পরিবেশে পত্নী মাইলির মতোই সে নান্দুকে বিশ্বাসঘাতক মনে করে জান্তব জিঘাংসায় হত্যা করে। কিন্তু নিঃসঙ্গ পাহাড়ী জীবনে এই নান্দুর জন্য হাহাকার করে পাহাড়ের গা বেয়ে সে নীচে নেমে এলে বনকুকুরের দল তাকে ছিঁড়ে খায়।	চরিত্রপ্রধান
বীরভোগ্য	চা বাগানের সুপারিভাইজার মধুবাবুর লোভ পড়েছিল সাঁওতাল মেয়ে টুনির ওপর। রাজুয়া টুনিকে ভালোবাসত। তাই প্লাকিংয়ের সময় টুনির সাথে মধুবাবু গোপনে কথা বললে	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
	রাজুয়ার তা অসহ্যবোধ হয়। প্রাক্টিসের কাজে মিথ্যে দোষ ধরে মধুবাবু ও তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। এই ঘটনায় রাজুয়ার মাথায় খুন চেপে যায়। টুনির ওপরও তার রাগ। এরপর দুদিন রাজুয়া বাগানে প্রাক্টিসে আসেনি। বাড়িতে বসে শান দেয় সড়কিতে। অন্যদিকে কুলি লাইনে ভোর বেলায় বাজে মাদলের বাজনা, কারখানার বাঁশি ছাপিয়ে ম্যানেজারের ঘরের রঙে রঙে আসে জোয়ারের ডাক। মাদলের শব্দে নববার্ষিকীর বোধন উৎসব। পিঠে তীর ধনুক হাতে বল্লম নিয়ে শিকার করতে যাচ্ছে কুলিরা। রাজুয়া ও যাচ্ছে শিকারে। ছোট শিকারে তার লোভ নেই। বাঘ, ভালুক সম্বর, নীলগাই সবই সে শিকার করবে। কিন্তু সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে শব্দভেদী লক্ষ্য স্থির করে রাজুয়া বল্লম ছুঁড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আকাশফাটা গর্জনে জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ড ডোরাদার রাজুয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।	ঘটনাপ্রধান
মৃত্যুবাণ	পুরুষানুক্রমে চারাল অভিরাম গুনিন গাঁয়ের বারোয়ারী তলার ধানের পসারী। ফকিরী-ঝাড়ফুঁক, শীতলার ভর এই সব করে গ্রামের মানুষের মধ্যে একটা অন্ধবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল সে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের দিনে ধানের গোলা বসল গ্রামে। সরকারী এজেন্ট, ইন্সপেক্টার অফিসারদের যাতায়াতের সুব্যবস্থার জন্যে রাস্তার কনট্রাক্ট নেয় কৃষ্ণপ্রসাদ। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে লোকাল রিক্রুটমেন্ট করতে গ্রামের লোকদের মজুরীর কাছে আহ্বান জানায় কৃষ্ণপ্রসাদ। অভিরাম গুনীনবাদ	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোনশ্রেণীর ?
	সাধন। তবুও সরকারী কনট্রাক্টর কৃষ্ণপ্রসাদের অধীনে মজুরীর কাজে যোগ দিল সবাই। অভিরামের স্ত্রী পদ্মা উপার্জনের লোভে কাজে যোগ দিতে চায়। অভিরাম তাতে বাধা দেয়। এদিকে হীরালালের মেয়ে অসুস্থ হলে অনেক অনুনয়ের পর অভিরাম আসে। কিন্তু ঝাড়ফোঁক-তুক-তাক ও সময়ে প্রয়োগেও সে কিছুতেই কিছু করতে পারল না। শেষে কৃষ্ণপ্রসাদের ডাক্তার এসে হীরালালের মেয়েকে সারিয়ে তোলে। ডাক্তার রেগে গিয়ে অভিরামকে লাথি মারে। প্রতিশোধ স্পৃহায় পুলিন কৃষ্ণপ্রসাদের কলোনীতে বসন্ত রোগের পুরনো গুটির মামড়ি বোতলে করে এনে ছড়িয়ে দেয়। কাজ অসমাপ্ত রেখে কৃষ্ণপ্রসাদের দল পিছিয়ে যায় দশ মাইল দূরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই মহামারীর কবলে পড়ে অভিরামের স্ত্রী পদ্মার অপূর্ব সুশ্রী দেহ বসন্তে পচে যায়। কিন্তু মৃত পদ্মার বিছানার নিচে অভিরাম দেখে একটি সোনার আংটি যা সে ডাক্তার অথবা কৃষ্ণপ্রসাদের হাতে দেখেছিল। শেষ পর্যন্ত অভিরাম নিজেও সেই রোগের শিকার হয়, মৃত্যুর পর শেয়ালে তার দেহটা ছিঁড়ে খায়।	চরিত্রপ্রধান
অনুধনিকার শেষ খুন	লক্ষ্ণৌ শহরের এক্সটার্নড গুণ্ডা অনুধনিকা পাঁচবার জেল খেটে বৈচিত্র্যময় জীবনের সন্ধানে কলকাতায় চলে আসে। সেখানেও গ্রেট মোগলাই হোটেলের মালিক খুন হওয়ার পর তার পেছনে লাগে পুলিশ। কিন্তু পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে অনুধনিকা চলে আসে উত্তর বাংলার এক পাহাড়ি ধরণের গঞ্জে। এখানে অনুধনিকা কসাই। খাসি কাটে, মাংস	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?

বেচে , জগদীশের দোকানে মদ খায় । সত্যনারাণ
হালুয়াইর ছোট মেয়ে রামদুলারী আর আড়তদার
মহাবীর প্রসাদের ছেলে বংশীধর এই দুজনের সাথে
তার বন্ধুত্ব । রামদুলারীর হাতে কলাপাতার ঠোঙায়
সে মেটে তুলে দিত । বংশীধর তার নেশার খরচ
যোগাত । কিন্তু যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের দিনে জিনিসপত্র
হল অগ্নিমূল্য , চারিদিকে শুরু হয় মড়ক । বংশীধর
তখন পাটভাঙা সিল্কের পাঞ্জাবী আর গ্লেজ কিডের
জুতো পরে স্ফূর্তি পান আর সিগারেট খেয়ে বিষয় বর্মে
মন দেয় , শহরে যায় , স্টেশনে যায় । কিন্তু এরই
মধ্যে বাংলা দেশে এসেছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ । এদিকে সত্যনারাণের
মেয়ে রামদুলারী আলুর কাছে আসা বন্ধ করেছে । একদিন
আলু তার খবর নিতে সত্যনারাণের বাড়িতে যায় । জানতে
পারে ভারী অসুখে রামদুলারী মারা গেছে । তার জন্য — চরিত্রপ্রধান
ওষুধ ও ভাত কিছুই জোটেনি , অথচ মরবার আগে একটু
ভাতের জন্য মেয়েটা কী কান্নাই না কেঁদেছে । এই ঘটনায়
আলুর মাথায় খুন চেপে যায় । যে তার রামদুলারীর
মৃত্যুর কারণ তাকে সে খুন করবেই । প্রথমে সে আসে
জগদীশের দোকানে এবং পরে সেখান থেকে মদে বিভোর হয়ে
সে আসে বংশীধরের গুদামে । গুদামের ভেতরেই সে বংশীধরের
পেট ফালাফালা করে কাটে । কিন্তু খুনের অপরাধে আলু
আবার ধরা পড়ল পুলিশের হাতে । এটিই তার শেষ খুন ।

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
আবাদ	নতুন জমি নতুন আবাদের স্বপ্নে বিভোর পরাণও তার ভাই জুড়ান ফজল ভাটি দেশের পটুয়াখালি মহকুমায় মুখুজ্জে বাড়ির মেজকর্তার দয়ায় তারাবন কেটে সাপ, বাঘ, কুমীর বিনাশ করে সেই মাটিতে সোনা ফলায়। দেশ বিভাগের পর মেজকর্তা এলেন এদেশে। দাঙ্গার কারণে মুসলমানের হাতে জুড়ান মারা যায়। জুড়ানের বউ ও তার মেয়ে হয় নিখোঁজ, ন্যাজারি হায়ে গাঙের জলে মরে পরাণের দুই ছেলে। শেষ পর্যন্ত আটমাসের ছেলেকে নিয়ে পরাণ আর তার বউ আসে দেশ ছেড়ে। এদেশের উদ্বাস্তু শিবিরে এসে পরাণের আশা আবার নতুন জমি গড়বে। করবে আবাদ। কিন্তু ক্যাম্পে নোয়াখালির রাজেন দাসের আঠারো বছরের মেয়েকে যখন রাতের অন্ধকারে কয়েকজন লোক এসে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে থাকে তখন রাজেনের আর্তনাদে পরাণ আবার শোনে বাঘের ডাক। অসুরের মতো ছোরা নিয়ে পরাণ তাদের পেছনে ছুটে গিয়ে কোদালের কোপে দুজনকে খুন করে। সেই খুনের অপরাধেই আদালতে বিচারকের সামনে তাকে আনা হয়েছে। পরাণ বিচারকের কাছে তার জীবনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরে খুনের কারণ ব্যাখ্যা করেছে।	ঘটনাপ্রধান
বৃষ্টি	কলেজে এক পোস্ট গ্রাজুয়েট একই সঙ্গে পড়াশুনা করে পঙ্কজ নন্দিতাকে ইয়ারকি, রসিকতা ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে তিতিবিরক্ত করে তুলেছিল। পরবর্তীতে চাকুরীর ইন্টারভিউ দিতে উভয়েই একই কলেজে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু চাকুরীর আশায় নন্দিতা গভর্নিংবডির মেম্বারদের কাছে পঙ্কজের নামে নিন্দা করেছে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও একবৃষ্টিঝরা রাতে সেন্টিমেন্টাল প্রইমারা	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোনশ্রেণীর ?
	স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুজনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা ম্লান হয়ে আসে। শতরুদ্র নন্দিতাকে জানায়, সে বিয়ে করেছে, অসুস্থ স্ত্রী এবং দুটি মেয়ে নিয়ে তার সংসার। নন্দিতা ও জানিয়েছে, তার স্বামী কার্শিয়াঙের যক্ষা হাসপাতালে। তাই ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে একে অপরের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নোত্তর দিতে গিয়ে বোর্ডের লোকদের সাথে দুর্ব্যবহার করল। চাকুরী কারোই হলোনা। কিন্তু ফেরার পথে ট্রেনে উভয়ের কাল্পনিক স্ত্রী-কন্যা ও স্বামীর কাহিনী মিলিয়ে গেল। দুজনে স্থির করে নেয় কলকাতায় ফিরে টুশন করে সংসার চালাবে। আসলে সেই বৃষ্টিঝরা রাতেই মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারী স্কুলের বারান্দায় দুজনের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচে দিয়ে মিলনের পরিবেশটি তৈরী করে দিয়েছিল।	ঘটনাপ্রধান
জরতী	মোহনবাগানের খেলার মাঠের মতোই যার জীবন, তাসের আড্ডায় ট্রিক্স করেই যার দিন কাটে আনন্দচঞ্চলতায়, এমন অমিয় মিত্র কলকাতার বস্তি গলিতে ডেকে আনত ছেলে-বেলার দিন। শেফালী ব্যানার্জী নামে বত্রিশ বছরের এক বিধবাকে দেবরদের সম্পত্তি কোন্দলের মধ্য থেকে বাঁচাতেই যেন সে তাকে রেজেস্ট্রী ম্যারেজ করেছিল। কিন্তু শেফালী বুঝেছে, অমিয় তার যৌবন দিয়ে তাকে দীক্ষা দিতে পারে নি, পাঠ নিয়েছিল তারই বার্ধক্যের। তাই শেফালীর ক্রিকেটী ছেলেটাকে আঁকড়ে রেখে মনের মতো মানুষ করতে চেয়েছিল অমিয়। শেফালী অমিয়র জীবনের এই ট্র্যাজিডি সইতে পারে নি বলেই পশ্চিমের এক শহরে তার ক্রিকেটী ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে আসে। ছেলেটি মারা যাওয়ার পর শেফালী সেখানকার	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	শ্রেণী
	মেয়েদের স্কুলে সেলাই আর গানের শিক্ষিকা হয়েছে। সুকুমার তার বন্ধুর সাথে সাহিত্য সভায় গিয়ে শেফালীর কাছ থেকে একটি চিরকুট পেয়ে ক্লিনান রোডের হরদেও নিবাসে এসে শেফালীর এই পরিবর্তিত জীবনের সন্ধান জানতে পারে।	ঘটনাপ্রধান
দুর্ঘটনা	স্টোভ দুর্ঘটনায় মুখ পুড়ে মুখশ্রী নষ্ট হয়ে যাওয়ায় স্কুল মিস্ট্রেস মিস ইন্দিরা চৌধুরীর সব সুখ ভেঙে গিয়েছিল বলে জীবনে যা কিছু সুন্দর তা ভেঙে চুরমার করে দিয়েই যেন সে শান্তি খুঁজে পেত। তাই স্টীমারে যাওয়ার সময় এক নববিবাহিত দম্পতির (বিভাস ও ইলার) সুখকর দাম্পত্য জীবনকে ছারখার করে দিতে সে বানিয়ে গল্প বলেছে। সেই গল্পে ডাক্তার বিভাস তার বন্ধু সত্যেনের (যক্ষ্মারোগীর) চিকিৎসা করতে গিয়ে সত্যেনের স্ত্রী লক্ষ্মীকে হাত করে নিতে চায়। এমনকি সত্যেনের মৃত্যুর পর সত্যেনের বাবা মার কাছে প্রশ্রয় পেয়ে বিভাস সুযোগ বুঝে একদিন লক্ষ্মীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবুও লক্ষ্মী তার বশ হয় নি বলে ক্ষুব্ধ ডাক্তার বিভাস লক্ষ্মী যখন হামে আক্রান্ত হয় তখন এমন একটি ওষুধ মুখে লাগাতে দিয়েছে যা লাগানো মাত্রই লক্ষ্মীর মুখ আগুনের মতো পুড়ে যায়। মিস ইন্দিরা চৌধুরীর বানিয়ে বলা এই গল্পে বিভাস ও ইলার সুখকর দাম্পত্য জীবনে বিষ ছড়িয়ে পড়ে।	চরিত্রপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্‌গুণীয় ?
জনশ্রুতি	কলকাতার ভদ্র পরিবারের দম্পতি রাঁচীর স্টেশনে বাঙালী তরুণী নিরু আর তার প্রৌঢ়া মায়ের মধুর আতিথ্য পেয়ে ধন্য হয়েছেন। কিন্তু তাদের আতিথ্য ও সুন্দর ব্যবহারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠলেও বাঙালী দম্পতি যখন জানতে পারে যে ওরা ভদ্রঘরের নয় অমনই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের লেশমাত্র অনুভূতিও তাদের মন থেকে মুছে যায়।	চরিত্রপ্রধান
জন্মান্তর	ফুলপাথাটার নামকরা গুন্ডা বুলাকিরাম ভানযোগী ফেরৎ সন্ধ্যার ট্রামে এক ইউরোপীয়ান প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ব্যাগ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হয়। কিন্তু সেইদিন রাতেই গঙ্গার ঘাটে (রথতলায়) রাত্রির অন্ধকারে সোনার গহনা পরা একটি মেয়েকে আত্মহত্যার হাত থেকে সে বাঁচায়। গয়নার লোভ তাকে একটুকু বিচলিত করে নি। গুন্ডা হয়েও একটি মহৎ অনুপ্রেরণায় মেয়েটির বুকে চেপে ধরা কচি ছেলেটিকে সে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিতে এগিয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সার্জেন্টের হাতে ধরা পড়ে বুলাকি, এই সুযোগ বুঝে মেয়েটি পালিয়ে যায়।	চরিত্রপ্রধান
বৃত্ত	ব্রজেন ডাক্তারকে টাকার লোভ দেখিয়ে নীলকণ্ঠ তার দূর সম্পর্কের বিধবা খুড়িমাকে তারকেশ্বরে নিয়ে যাওয়ার নাম করে ব্রজেন ডাক্তারের পাগলা গারদে রেখে আসে। প্রজাদের প্রতি সদাশয় হলেও নীলকণ্ঠের মন থেকে এই অপকর্মের আতঙ্ক কাটে না। পুত্র সিতিকণ্ঠ ও স্ত্রী নিভাননীকে সে ভয় পায়, পাছে তাকেও পাগল সাজিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করে সিতিকণ্ঠ। হলও তাই। তীব্র অবিশ্বাস করে একদিন সিতিকণ্ঠের দিকে সে রাম দা ছুঁড়ে	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোনশ্রেণীর ?
	দেয়। ভাগ্যক্রমে শিতিকণ্ঠ বেঁচে যায়। কিন্তু এই ঘটনায় স্ত্রী ও পুত্রের কাছে নীলকণ্ঠ পাগল সাব্যস্ত হয়। খুড়ীমাকে প্রতারণা করে অন্যায়ভাবে নীলকণ্ঠ সম্পত্তির মালিক হয়েছিল। ঠিক সেই বৃত্তাকার পথে পুত্র শিতিকণ্ঠের ও দিন এসেছে।	চরিত্রপ্রধান
দুর্লঙ্ঘ্য	বিপত্নীক পুত্রহারা জমিদার রাজ্যেশ্বর পাল চৌধুরী তাঁর একমাত্র ভাই হরেশ্বরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। স্কুলে পড়বার সময়ে ক্লাসে হর্ষ নামে পরিচিত এই হরেশ্বর একদিন ছেলেদের কাছে মার খেয়ে দাদাকে এসে সে কথা জানান। সব কথা শুনে রাজ্যেশ্বর তাকে রেসের ঘোড়ার মতো সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জনের উৎসাহ দিলেন। হলও তাই। হরেশ্বর দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করে একদিন দাদার বিরুদ্ধেই দাঁড়াল। জমিদারীর সেওসমান অংশীদার বলে দাবী করল। এতে রাজ্যেশ্বর ধর্মকর্মে মন দিয়ে সমস্ত জমিদারী তাকে লিখে দিয়ে বৃন্দাবনে যেতে মনস্থ করলেন। কিন্তু উত্তেজিত হরেশ্বর একদিন নামকীর্তনের আসর থেকে ডেকে রাজ্যেশ্বরকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করল। রাজ্যেশ্বরের দুর্লঙ্ঘ্য মহত্ত্বকে সে কোনদিন অতিক্রম করতে পারেনি বলেই সে তাকে খুন করেছে। কিন্তু অনুশোচনায় সে নিজেই দারোগার কাছে খুনের অপরাধ স্বীকার করে গ্রেপ্তার বরণ করতে চেয়েছে।	চরিত্রপ্রধান
বিভীষণ	টাকা আর মদের লোভে পদোন্নতির আশায় মিলের হাজরা বাবুর (চ্যাটার্জীবাবুর) কাছে রাজেন্দু ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের নাম ফাঁস করে দেয়। অল্প দিন কয়েকের মধ্যেই মিলের চার পাঁচজন কর্মী ছাঁটাই হয়ে যায়। প্রতিবাদে মালিকের বিরুদ্ধে	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	মিলের কর্মী ও কুলিরা ডাকে ধর্মঘট । ধর্মঘটের কথা শুনে রাজেন্দু মনে মনে ভয় পায় , পাছে তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা সবাই জেনে যায় । চ্যাটার্জীবাবু ধর্মঘটের ষড়যন্ত্রকারীদের নাম সংগ্রহের জন্য আরেকবার রাজেন্দুকে লোভ দেখায় । রাজেন্দু প্রথমে রাজী হয় নি , কিন্তু পূর্বের অন্যায়কে চাপা দেওয়ার জন্য শয়তানের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে সে নাম ফাঁস করে দেয় ।	চরিত্রপ্রধান
কানাই	যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষের দিনে রঞ্জনের বাড়ির চাকর কানাই আর মুরারী ডাক্তার দুজনের অধিষ্ঠান সমাজের দুপ্রান্তে হলেও ঠকানোর ব্যবসাতে দুজনেই পারদর্শী । কানাই হাত পেতে টাকা নেয় না । কিন্তু গোপনে বাজার খরচের পয়সা বাঁচিয়ে আত্মসাৎ করে । অন্যদিকে মুরারী ডাক্তার বন্ধু রঞ্জনের স্ত্রীর (অনুর) চিকিৎসার জন্যে পাশের দোকানের নাম করে নিজের দোকানের পেছনের আলমারী থেকে কুইনাইন এনে দেয় ।	চরিত্রপ্রধান
ব্যাধি	যামনার পাপচক্রে বিপর্যস্ত পালচৌধুরী বংশের মেজকর্তা যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের দিনে দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে লোহার কারবার করে বড়লোক হয়ে ওঠেন । তিন বছর পর দেশে ফিরে বিশ হাজার টাকা খরচ করে তিনি জন্মাষ্টমীর উৎসব করেন । নীলমণি সেখানে সপরিবারে নিমন্ত্রিত । সেও সামান্য মহাজনীর কারবার থেকে নামমাত্র মূল্যে কৃষকদের ধানী জমি কিনে ও কাসেম ফকিরকে ঠকিয়ে কুড়ি বিঘা থেকে একশো বিঘা ধানী জমির মালিক । মেজকর্তার বাড়িতে উৎসবের আড়ম্বর ও কলরবের ফাঁকে নীলমণি দেখলে চরণামৃতের পাত্র হাতে এগিয়ে আসছেন মেজকর্তা , কিন্তু তাঁর হাতের পিঠে কুষ্ঠের দাগ , অধিক সোনা ঘাটার ফল । বাড়ি ফেরার পথে কাসেম ফকিরের ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নীলমণিরও দেখে তার হাতে একটি কুষ্ঠের দাগ ।	চরিত্রপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোনশ্রেণীর ?
একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকা -	নিত্যানন্দ চৌধুরী পেগের নেশায় বিভোর, তবুও গরীবদের প্রতি অসীম মমতায় তাঁর আত্মা বেদনাচ্ছন্ন, চোখ অশ্রুসিক্ত। বস্তির মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্যে তিনি ব্যাকুল। অথচ টালীগঞ্জে তাঁর নিজের বস্তিতেই মানুষ কত কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। গল্পের বক্তাকে তিনি গরীব মানুষদের উপর ধনীদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে 'দুঃখী দুনিয়া' নামে একটি সিনেমার গল্প লিখতে বলেছেন। দুর্ভিক্ষ আর বস্তির চরিত্রপ্রধান চিত্র তাতে থাকবে। কিন্তু বক্তা যখন তাঁকে নিজের বস্তি থেকেই ছবি তুলতে বলেন তখন নিত্যানন্দ চৌধুরী বলেন, তিনি বস্তি তুলে দিয়েছেন, পরিবর্তে পাঁচ লাখ টাকা ব্যয়ে সেখানে তিনি স্টুডিয়ো খুলবেন। তাঁর এই অস্বাভাবিক ও হাস্যকর গরীব প্রীতিবোধের দিকে তাকিয়ে বক্তা তাঁকে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে গল্প তাঁর দরকার হবে না কারণ আবার দুর্ভিক্ষ আসছে। রাস্তা থেকেই ছবি তুলে নিতে পারবেন তিনি।	
দর্পন	ব্যাংকের কেরানী চারু নাটকে ফিমেল পার্ট করে বলে তার কথাবার্তা আচার আচরণ মেয়েলী ধরণের হয়ে যায়। বন্ধু মহলে, অফিসে তাকে চারুবালা নামে ডেকে ঠাট্টা ও রসিকতা করে সবাই। কিন্তু কমলা নামে ঢ্যাঙা চেহারার মেয়ের সাথে বিয়ের পর চারুর জীবনে আসে বিপর্যয়। কমলা ছেঁড়া কাপড় পড়তে পারে, তিনদিন উপোস করতেও রাজী, কিন্তু মেয়েলী পুরুষকে সইতে পারে না। একটি ঘটনায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে। গোপাল ডাক্তারের	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	ছোট বোন টেপীর প্রেমপত্র মণীশের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল চারু । কিন্তু পকেট থেকে কোন ফাঁকে সেটা পড়ে গিয়ে কমলার হাতে আসে । তাতে কমলা চারুর প্রতি বিরক্ত হয়ে ওঠে । নখদর্পণের কাজলে মানুষ যেমন প্রেতাত্মাকে দেখে কমলার ও তেমনি কালো ভয়ঙ্কর মুখ দেখে চারু ভয় পেয়ে গেল । ক্লাবে গিয়ে সে বলল , থিয়েটার পার্ট জীবনে আর কোনদিনও সে করবে না ।	ঘটনাপ্রধান
বাইচ	নৌকো বাইচ প্রতিযোগিতায় পাশাপাশি সমানে সমানে চলছে দুটো নৌকো । গলুইয়ের মাঝি তিন নম্বর দাঁড়ির উদ্দেশ্যে কটুক্তি ছোঁড়ে । নদীর তীরে কাতারে কাতারে লোক , বিজলী , পটকা হাউই আর মানুষের হট্টগোল , ডঙ্কার আওয়াজ আর জয়লাভের প্রাণান্তকর চেষ্টা । তিন নম্বরী দাঁড়ে টান দিলেও তার মন পড়ে আছে গ্রামে । সেখানে তার শতচ্ছিন্ন ছাউনির দুটো ঘরে জল পড়ে , পোকা পড়ে । মা-মরা আট বছরের মেয়েটি থাকে অনাহারে । দুর্ভিক্ষের কবলে তার বউ ও ছেলে দুটি মারা গেছে । তাই দুর্বল তিন নম্বর দাঁড় টানতে গিয়ে অকথ্য গালি শোনে । তবুও শেষবারের মতো দাঁড় টানতে গিয়ে তার মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসে রক্ত । তারপর হঠাৎ দুর্বল শরীরে নৌকা থেকে জলে খসে পড়ে যায় তিন নম্বর ।	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
গোখরো	ঘরে সাপ ঢুকলে ভূপতির স্ত্রী বিভা ভয় পায়। অফিস ফেরৎ ক্লান্ত ভূপতি কিছুতেই সাপটাকে মারতে পারে নি। ভূপতির শ্যালিকা আভা সেটাকে খুঁজছে। পাশের বাড়ি থেকে করুণা সিন্ধুও বন্দুক নিয়ে এসেছে সাপটাকে মারতে। করুণাসিন্ধুর লোভ আভাকেও হস্তগত করা। আভার জন্য চাকরীর লোভ দেখিয়ে সে ভূপতিকে পথে আনতে চায়। এদিকে বাইরে ছাই-গাদার ওপরে সাপটিকে মারতে শুরু করেছে আভা। আভার নাম শুনেই করুণাসিন্ধু বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আভার হাতের লাঠির কালো কুচকুচে গোখরোর মৃতদেহ আর থ্যাতলানো মুখ দেখে ভূপতি আর বিভা স্তম্ভিত। এই ঘটনায় আতঙ্কিত করুণা সিন্ধু আভার চোখের বন্য আলো দেখে পাংশু মুখে দ্রুতবেগে বিদায় নেয়।	ঘটনাপ্রধান
প্রপাত	কালো চেহারার বরদাপ্রসাদবাবু তাঁর সুশ্রী মেয়ে বন্দনার রূপ নিয়ে কুশ্রী স্ত্রীকে সন্দেহ করলেও কুৎসিত মেয়ে ছায়ার সাথে চিন্ময়ের বিয়ে ঠিক করতে বন্দনাকেই মেয়ে সাজিয়ে দেখিয়েছেন। চাঁদপাল ঘাটে এসে বন্দনা সে কথা চিন্ময়কে জানিয়ে দেয়। ছ' বছর পরে রাচিতে মেয়ে দেখতে গিয়ে বন্ধুদের সাথে হুড্রু প্রপাতে গিয়ে বন্দনাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে চিন্ময় বুকে টেনে নেয়।	ঘটনা প্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
রায়, সিং ও ঘাটে (এবং অর্জুন)	রায়, সিং ও ঘাটে (এবং অর্জুন) একটি চলমান গাড়ির ড্রাইভার আর তরুণী একটি মেয়েকে হত্যা করে প্রায় দশ হাজার টাকা, সোনার গয়না, ঘড়ি প্রভৃতি নিয়ে চম্পট দেয়। কিন্তু কুয়াশা ভরা পাহাড়ী পথে পালাতে গিয়ে তাদের জীপ খাঁদে পড়ে যায়। অর্জুন খাঁদের অনেক নিচে পড়ে মারা যায়। সিং ও ঘাটে রায়ের সঙ্গে বিবাদ করে মৃত্যুকে ডেকে আনে। রায়ের প্রচণ্ড ক্রোধ ও লোভের ফলে সিং ও ঘাটের মৃত্যু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রায়ও বাঁচেনি। দশ হাজার টাকা ও সোনার গয়না একা একা ভোগ করতে পারবে - এই লোভেই অদ্ভুত শক্তিতে পাহাড়ের গা বেয়ে অতি কষ্টে সে উপরে উঠে আসছিল, কিন্তু পাহাড়ী পাইথন তাকে জড়িয়ে রাখে।	ঘটনাপ্রধান
অনেক বেশী আলাপ	বিয়ে বাড়িতে পরিবেশনের কাজ করার সময় কনকলতার সাথে কুমার কান্তির পরিচয়। তারপর ট্রামে দেখা, কথা বলা ও কাছাকাছি অফিসে কাজ করে উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতা জন্মে। দেশে বউ ছেলে - মেয়েকে বঞ্চিত রেখেও কনকলতাকে ছোট ভাইয়ের মাইনে বাকীর জন্যে সে টাকা ধার দিয়েছে। হাওড়া স্টেশনে কনকলতাকে সে ট্রেনে তুলে দিত। চকোলেট, শাড়ি, সাবান প্রভৃতি দিয়ে ভরিয়ে তুলত তার মন। কনকলতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই কুমারকান্তি কলকাতার ভীড় আর বদ্ধ জীবনযাত্রা থেকে মুক্তি নিয়ে উত্তরপাড়ার গঙ্গা আর খোলা আকাশের স্বাদ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু সেখানেও কৌতূহলী মেয়েদের ভীড় এড়িয়ে দুজনের জন্য এতটুকু অবসর জোটেনি। তাই	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোনশ্রেণীর ?
	কনকলতা ও তার মায়ের মিষ্ট ব্যবহার সত্ত্বেও ফেটান অ্যানার্জির রোগী কুমার কান্তি স্টেশনে ছুটে আসে । কিন্তু পরবর্তীতে কনকলতাকে ধারের টাকা আদায়ের জন্য চিঠি লিখেও দ্বিধা দ্বন্দ্ব সে তা বাক্সে ফেলতে পারে নি ।	ভাবপ্রধান
দেনা	বঙ্কুর কাছে ধার নিয়ে শিবদাসবাবুর কুৎসিত কালো মেয়ে উমা রেডিয়োতে চান্স পায় । কিন্তু প্রোগ্রামের পর সিতাংশু চ্যাটার্জীর সঙ্গে যখন উমা রেডিও স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসে তখন বাইরে অপেক্ষমান বঙ্কু হতাশ হয়ে ট্রামে উঠে চলে যায় । একমাস পরে দ্বিতীয়বার রেডিওতে চান্স পেয়ে রেডিও স্টেশনের চিঠি হাতে নিয়ে উমা বঙ্কুর কাছে ছুটে যায় ও তার সামনেই টুকরো টুকরো করে সে চিঠি ছিঁড়ে টুকরো গুলোর দিকে তাকিয়ে বঙ্কুকে তার খারাপ মনে হলেও মুখে ছিল কৃতজ্ঞতার ভাষা ।	চরিত্রপ্রধান
অভিনয়	কাশিবাসী পিসিমার আগমনে প্রদ্যোৎ নাহিড়ীর স্ত্রী সবিতা প্রথমে ভালোই ব্যবহার করেছে । কিন্তু বাড়িতে মুরগীর মাংস নিয়ে আসা ও সবিতার ছোটভাই মুকুলের কুকুরকে কেন্দ্র করে পিসিমার সাথে সবিতার মন কষাকষি হয় । প্রদ্যোৎ নাহিড়ীও পিসিমাকে কিছুই বলতে পারে না । এরূপ পরিস্থিতিতে সবিতা রাগ করে বাপের বাড়ি চলে আসে । অনেক চেষ্টা করেও যখন তাকে ফেরানো গেলনা তখন শ্যালক মুকুলের পরামর্শে প্রদ্যোৎ তার অফিসের টাইপিস্ট মায়ার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে সবিতার মনে জেলাসি সৃষ্টি করে । বোটানিক্সে , কাপড়ের দোকানে এবং সবশেষে সিনেমা	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোনশ্রেণীর ?
	তখনই ইন্টারভেলের সময় সবিতা মুকুন্দকে পাঠিয়ে প্রদ্যোৎকে ডেকে আনে এবং তখনই তাদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়। কিন্তু প্রমোদন ও ভাইয়ের চাকরীর আশা প্রত্যাখ্যান করে টাইপিস্ট মায়া চাকরী ছেড়ে দেয়।	ঘটনাপ্রধান
সেতু	তরুণী ম্যাট্রিক স্কুল শিক্ষিকা সন্ধ্যা হিরন্ময়ের বাড়ি থেকে টিউশন সেরে রাতে বাড়ি ফিরছিল। গলির মোড়ে বসে থেকে ছোকরা সুখেন তাকে কটূক্তি করে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য যেদিন হিরন্ময়ের সাথে সন্ধ্যা গাড়ি করে এসে গলির মোড়ে নেমে বাড়িতে এগিয়ে গেছে সেদিন সুখেন প্রকাশ্যে কিছু বলেনি। পরদিন অবশ্য স্কুলে যাবার সময় সন্ধ্যাকে লক্ষ্য করে সে কৌতুক বাণ ছুড়ে দেয়। দ্বিতীয় দিন বৃষ্টির জন্য হিরন্ময় গাড়িতে করে সন্ধ্যাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে এসে গলির মোড়ে নেমে ওয়াটার প্রুফ দিয়ে জড়িয়ে সন্ধ্যাকে নিয়ে এগুতে থাকে। কিন্তু হিরন্ময় সন্ধ্যার কোমর জড়িয়ে ধরলে তার চীৎকার শুনে সেই নাগপাশ থেকে সন্ধ্যাকে মুক্ত করার জন্য অভদ্র ছোকরা সুখেনই এগিয়ে এসে ছাতা দিয়ে সন্ধ্যাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। আর ভদ্রবেশী হিরন্ময় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে লজ্জায় অন্ধকারের দিকে এগোয়।	চরিত্রপ্রধান
পলায়ন	পাশাপাশি ভাড়াটে বাড়ির মণিমালার সাথে প্রভাতের প্রেম। একদিন প্রভাত মণিমালাকে নিয়ে ট্রেনে করে পালিয়ে যাচ্ছিল	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	হরিদ্বারে । কিন্তু ট্রেনে প্রভাত আনন্দোচ্ছল থাকলেও মণিমালার মনে থাকে ভীতি । পাশের বার্থের মোটা ভদ্রলোক ও পুলিশের উপস্থিতিতে মণিমালা দুর্বল হয়ে ওঠে । চা কিংবা অন্য কোন খাবার তার কাছে এখন বিস্বাদ লাগে । তাই প্রভাত হাসি খুশি থাকলেও পলায়নের অপরাধের জন্য মণিমালা পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে মনে মনে শান্তি পেতে চায় ।	ঘটনাপ্রধান
ইন্টারভিউ	অন্যের শাড়ি পরে চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে এসে কর্মপ্রার্থী আর আর মেয়েদের দেখে অনিলা বুঝতে পেরেছিল চাকরীর প্রয়োজন কেবল তারই বেশী নয়, অনেকেরই । দূরসম্পর্কের আত্মীয় অমিত তার অফিসের হেড ক্লার্কের কাছ থেকে অনিলার চাকরীর ব্যাপারে আশ্বাসও পেয়েছিল । কিন্তু হেডক্লার্ক অনিলাকে শুধু আশ্বাসই দিতে পারেন, ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন, চাকরী দিতে পারেন না ।	ঘটনা প্রধান
হার্মাদের একরাত	নিম্নবাংলার মানুষ দুর্ধর্ষ হার্মাদের আতঙ্কে বড় বড় নদীর কাছ থেকে পালিয়েছে দূরে । গ্রাম আক্রমণ করে ধনরত্ন, মেয়ে মানুষ কিছুই ওরা রেখে যায় না । হেমন্তের এক ভরা জ্যোৎস্নায় হার্মাদেরা এসে গ্রামে ঢুকেছে । সব সাবধানী মানুষ দূরে সরে গেছে । কেবল বাসুদেব মল্লিকের কেশব গোঁসাই আর রায় বাড়ির সত্তর বছরের বুড়ি পড়ে রইল গ্রামে । হার্মাদেরা কেশবকে খুন করে বাসুদেবের সোনার অলংকার লুট করল । বুড়িকে মারধোর করল । তারপর নদীর দিকে ফিরল ।	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
	এদিকে সাহসী যুবক কিশোর আর জয়রাম হার্মাদের ডিঙির পাহারাদারের চোখে বালি ছুড়ে দিয়ে তাদে হত্যা করে প্রত্যাক্রমণকারী হার্মাদের দল ডিঙিতে উঠতে গিয়ে চোরাবালির জলে ডুবে যায়। দূরে হার্মাদের অপেক্ষমান জাহাজ কামানের আওয়াজ তোলে। কিন্তু কেউ ফিরলনা দেখে দ্রুতগতিতে নোঙর তুলে চলে যায়।	ঘটনাপ্রধান
বসন্তবিলাস কাব্য	রাজা সোমগুপ্ত রাণী পট্টমহাদেবীর মনতুষ্টির জন্য বসন্তবিলাস কাব্য রচনায় কবি চন্দ্রমণি পুলোরকের শরণাপন্ন হন। শবরদেশীয়া কলহপ্রিয় পত্নী গণিকা পুলোরকের উদ্যানাগার বিনষ্ট করে দেন। আর পুলোরকের জন্য চম্পাবনে উদ্যানাগার নির্মান করতে গিয়ে রাজা সোমগুপ্ত চম্পাবনে আশ্রিত শবরদের নৃশংস ভাবে উচ্ছেদ করেন।	ঘটনাপ্রধান
ভাটিয়ালী	দেশ বিভাগের পর বড় ছেলে সুশান্ত স্ত্রী পুত্র নিয়ে কলকাতায় থাকলেও, ছোটো ছেলে অশোক ছাত্রাবস্থাতেই স্বদেশী করতে করতে নিখোঁজ হলেও মা দেশেই রয়ে গেছেন। ষাট বছর বয়সেও তিনি তকলি কাটেন, পৈতে বানান। নিম গাছের ওপর চাঁদ ওঠে, দূরের নদী থেকে ভেসে আসে ভাটিয়ালী গান। রাতের আকাশ, বাতাস আর নদীর জলের সাথে এ গান একতানে বাঁধা। গৃহদেবতার পুরোহিত শশী ভট্টাচার্যের বড় মেয়ে সুধাকে ডেকে মা এক আধসের চাল দেন। সুধা মা কে মনসামঙ্গল পড়ে শোনায়। একদিন	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্‌শ্রেণীর ?
	একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধা মনসামঙ্গল পড়ছে । মা শুনছেন । এমন সময় অশোক এসে দাঁড়ায় উঠোনে । ছেলেবেলার সুধা যে এতটা বড় হয়েছে অশোক তা ভাবতেই পারেনি । অশোক এখন থেকে মায়ের কাছেই থাকবে । মায়ের কথা মতো সুধাকে সে বিয়ে করতে রাজী হয় । কিন্তু মায়ের ইচ্ছা অশোক পূর্ণ করতে পারে নি । শেষ রাতে দারোগা এসে ডাক দেয় অশোককে । সেই ডাকেই মাকে প্রণাম করে বিদায় নেয় অশোক । হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়েও বিদায় দিলেন মা । দূরের নদী থেকে আবার ভেসে আসে ভাটিয়ালী গান যে গানের সুরের সাথে আকাশ, ক্ষেত্র আর সূর্য একতানে বাঁধা ।	ভাবপ্রধান
ছায়াসঙ্গিনী	মহামহোপাধ্যায় কমলের মেয়ে টুনু চেহারায় জীবন যৌবন ছবির নায়িকা মিতালী দেবীর মতো । কিন্তু ডিরেক্টার দত্ত টুনুর নিজস্ব কোন চেহারা না থাকায় ফিল্মস্টার হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলেন না । অবশ্য মিতালী দেবীর কথাতেই টুনুকে মিতালীর ডুপ্লিকেট রূপে নেওয়া হয় । তবু টুনু তাতে শান্তি পেল না । তার আশা ছিল সংস্কৃত পড়ে ভবিষ্যতে সতী সাবিত্রী অরুন্ধতী হবে, কিন্তু মিতালীর নকল সাজায় সে নিজত্ব হারিয়ে ফেলে । শিল্পী তরুণ কুমার আসল মিতালীকে ভালোবাসে, তাকে না । কিন্তু টুনুর মতো চোখ আর চোখের জল মিতালীর নেই বলে মিতালীকেবিয়ে করতে চেয়েও চোখের	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ গুণীর ?
	জলের জন্যে প্রাণ ছটফট করলে সে ছুটে আসবে টুনুর কাছেই । দুঃখ দেবে একজন, কান্না দেবে সে -একথা ভেবে টুনু রাজী হয় নি । সে বুঝতে পারে, পর্দার অভিনয়ে মুক্তি নেই । জীবন ভরে ডুপ্লিকেটের কাজ করে যেতে হবে - এই দুশ্চিন্তায় সায়নাইড খেয়ে টুনু আত্মহত্যা করে ।	ভাবপ্রধান
নীলকণ্ঠ	সুকুমার আর অনুশ্রীর দাম্পত্য কলহের বিষজ্বালা সইতে না পেরে ওদের ছ বছরের মেয়ে খুকু ছাদের উপরে উঠে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে । খুকুর এই অবস্থায় সুকুমার ও অনুশ্রীর চেতনা ফিরে আসে । তুচ্ছ অর্থহীন মনোবিকারে অস্বচ্ছ চোখ নিয়ে ওরা বুঝতেই পারেনি ছোট মেয়ে খুকু তাদের দাম্পত্য কলহের সমস্ত বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল ।	ঘটনাপ্রধান
অন্ত্যেষ্টি	একজন নামকরা অভিনেতার মৃত্যুর পর শোকযাত্রা করে মৃতদেহ আনা হয়েছে নিমতলা শ্মশানে । চিত্রতারকা, চিত্রনায়িকা সহ শ্মশান ঘাট লোকে লোকারণ্য । কিন্তু এত মানুষের কোলাহলে সেই অভিনেতার স্ত্রী কেওড়াতলা মহাশ্মশানে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে আসবে জেনে চার বছরের ক্ষুধার্ত ছেলেকে নিয়ে গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে অপেক্ষা করছিলেন, সে খবর কেউ রাখেনি ।	ঘটনাপ্রধান
বাড়িবদল	উত্তর কলকাতার শ্যাওলাধরা স্যাঁত স্যাঁতে একতলার বাড়িতে আটবছর ধরে বাস করে বারবার বাড়িবদলের চেষ্টা করেও শৈলেন ও ললিতা বাড়ি বদলাতে পারেনি । শেষ পর্যন্ত সেই বাড়ির নিচতলায় ভাড়াটে উকিলবাবুর স্ত্রীর কথায় অসহায় হয়ে এন্টালীতে	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	বাড়ি ঠিক করেও তারা যেতে পারেনি । কারণ উকিল-বাবুর অশিক্ষিতা স্ত্রী তার কৃত অপরাধের জন্যে ললিতার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল । সে ভেবেছিল, ললিতাকে গালি-গালাজ করার জন্যেই তার মেয়ে জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল ।	ঘটনাপ্রধান
খেলনা	খেলনার দোকানে কাজ করতে করতে মীরার জীবনে নিষ্প্রাণতা নেমে আসে । অন্য দিকে পাড়া গাঁয়ের অন্ধকারেও বেণুর অনাথ আশ্রমের সেবা পরায়ণ জীবনযাত্রার মধ্যেও আছে প্রশান্তি ।	ভাবপ্রধান
পান্থনিবাস	দার্জিলিংয়ে সে মাসে একটি পান্থশালায় প্রায় সব প্রদেশের বিচিত্র মানুষ সমবেত হয়েছেন । পান্থশালার মালিকানী মিস রায়, পাঞ্জাবী মেয়ের সাথে মারাঠী ছেলের প্রেমালাপ, মাড়োয়ারী ছেলের বাহুবল পরীক্ষা, চাকলাদারের রসিকতায় পান্থশালার পরিবেশ অদ্ভুত হয়ে উঠেছে । এছাড়া একটি কুড়ি বাইশ বছরের ছোকরার মেয়েদের সান্নিধ্য পাবার আশায় বাচ্চাদের সাথে বল খেলা, অমিত দত্তর ব্যবহারে ভূতপূর্ব এম-পি নরোত্তম বাবুর রোষ, কাঞ্চন বাড়ুয্যের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে পান্থনিবাস যখন মুখর তখনই পাহাড়ে ধসে নামে এবং পান্থনিবাসের সকল কর্মতৎপরতা স্তব্ধ হয়ে যায় । নেপালী নানীর সাতমাসের ছেলে পাহাড় থেকে গড়িয়ে মারা যায় । গরীব মা একটাকার লোভে নানীর কাজ করতে এসে পায় শাস্তি ।	ভাব প্রধান
ক্ষত	গভীর রাতে সিতাংশুর ইঁদারা থেকে জল নিতে আসায় বিরাজবাবুর ভাইঝি বুলুকে চোর মনে করে সিতাংশু মশারীর স্ট্যান্ড দিয়ে আঘাত করে কপালে ক্ষত করে দেয় । পিতৃমাতৃহীন বুলুর কাকা বিরাজবাবু বুলুর এই আচরণে লজ্জিত । এক সন্ধ্যায় অন্ধকারে বুলু এসে সিতাংশুকে তার চৌর্যবৃত্তির	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	(মানসিকব্যাধির) কথা জানায় । পরদিন ভোরের ট্রেনে বুনু কলকাতায় চলে যায় ডাক্তার দেখাতে । বুনু চলে যাওয়ার পরই সিতাংশুর মনিব্যাগ , বিরাজবাবুর স্ত্রীর চারগাছির হার , ছ'গাছা চুড়ি পাওয়া যায়নি । এই ঘটনায় বিরাজবাবু বুনুকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেন । কিন্তু দারোগার কাছে জবানবন্দী দিতে গিয়ে বুনু বলেছে , হার ও চুড়ি তার মায়ের এবং একশো টাকা সে নিজের চুড়ি বিক্রী করে পেয়েছে । তাছাড়া সিতাংশুও তার অফিসের ড্রয়ারে মনিব্যাগটিকে পেয়ে যায় । তবু মিথ্যে অহঙ্কারের ভয়ে সে বুনুকে বাঁচাতে চাইল না । এইভাবে সত্যকে গোপন করে সিতাংশু ভাবল জেলে গিয়েই বুনুর মানসিক ব্যাধি দুঃখে লজ্জায় সেরে উঠবে । কিন্তু এই ঘটনায় সিতাংশু কেবল বুনুর কপালেই ক্ষতচিহ্ন এঁকে দেয়নি , তার জীবনের দিগদিগন্ত জুড়ে একটা ক্ষতের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে ।	
করাত	ম্যাজিকের আসরের শেষ আইটেম উজ্জ্বল আলোর বৈদ্যুতিক করাতের হিংস্র দাঁত দেখে অরুণা ভয় পেলেও গোপন প্রতিহিংসায় সোমেন বলে উঠেছে 'ইউনিক' । অনুপম সেন অরুণার প্রথম প্রেমিক । গোপনে অরুণার গানের খাতায় অনুপম সেনের নাম ও তাকে লেখা গানের কলি দেখে সোমেনের সন্দেহ তীব্র হয় । দীর্ঘ আট বছর ধরে এই কারণেই সোমেন তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছে । তাই ম্যাজিকের আসর থেকে বেরিয়ে ময়দানের পথে তিনটে অপঘাত , খুন , রক্তের আঁষটে গন্ধ , সোমেনের মুখে সিগারেটের আগুন ও অনুপম সেনের নামোচ্চারণ এ সবের মধ্য দিয়ে সোমেনের মনের কুটিল হিংসার অবচেতন চরিতার্থতাই আত্মপ্রকাশ করেছে বলে অরুণা বুঝতে পারে । ম্যাজিকের তীক্ষ্ণ ধার করাতের দাঁত অরুণার জীবনকেও সমানে কেটে চলেছে ।	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
খাঁচা	সরোজের বাড়ির ভাড়াটে ডুমুর ফুলের মেয়ে বুনোর পোষা টিয়ে খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে যায় সকালে। গাছের সরু ডালে উঠে বুনো সেটিকে ধরেছে। পোষা হলেও বুনোর ডান হাতের কব্জীতে সেটি কামড় দিয়েছে। সরোজ রক্ত দেখে বুনোর হাত চেপে ধরে আইডিন দিতে যায়। তাতে বুনোর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। দুপুরে সরোজ একটি খাঁচা হাতে করে আসে ডুমুর ফুলের বাসায়। বুনোর জন্যেই সে খাঁচাটি এনেছে। লজ্জায় বুনো পালিয়ে যায় ঘরের মধ্যে। বুনোর মা হেসে বলেন যে বুনোর একটি খাঁচা সত্যিই দরকার।	ভাবপ্রধান
নকল	এক রবিবারে জ্যাঠামণি আর জ্যাঠিমার সাথে বেড়াতে গিয়ে নির্জন গঙ্গার ধার, বেলা শেষের রঙমাখানো ঘাসের ঢেউয়ে সুদেবের সাথে পাশাপাশি বসে ললিতা আকস্মিকভাবেই জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়াকে কাছে পেয়েছিল। কিন্তু আরেক রবিবারে কৃত্রিম ভাবে এই সুযোগ পেয়েও ওদের ভালো লাগেনি। প্রথম দিন যা আপনা থেকে ধরা দিয়ে চলতে চলতে কুড়িয়ে পাওয়া একখণ্ড হীরের মতো হাতের মুঠোয় এসেছিল, তাকে নতুন করে আরেকদিন পাওয়ার জন্যে কুশ্রী উদ্যম ব্যয় করে পেয়েও মনে হল কুৎসিত।	ভাবপ্রধান
সিংহ	ছোটবেলায় খুড়িমা ও মজুমদার শাসনের মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়ে অফিসের দীনতম উপেক্ষিত কেরাণী বাড়িতে স্ত্রীর কাছেও অবজ্ঞার পাত্র। স্ত্রীর পাল্লায় পড়েই একদিন সার্কাস দেখতে গিয়ে ছোট সাহেবের টাক ও ওভারকোট দেখে সে নার্ভাস হয়ে যায়। কিন্তু সবশেষে সিংহের খেলা দেখে এই হীনমনা উপেক্ষিত	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	কেরাণী তার জীবনের সমস্ত দুর্বলতা আড়াল করার জন্যে ছোটবাবু ও দর্শকদের অবাক করে দিয়ে সার্কাসের আসরে লাফিয়ে পড়ে দু হাতে সিংহের কেশর চেপে ধরে। তীব্র গর্জনে সিংহের প্রচণ্ড থাবা তার মুখ ও সার্কাসের আসরের লোহার বেড়ায় ভাগাভাগি হয়ে পড়ে। তারপর জানায়, তার পালস ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু সে তখনও অচৈতন্য অবস্থায় আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ শিকার করে চলেছে।	চরিত্রপ্রধান
চায়ের বিকেল	একটি পরিচ্ছন্ন চায়ের বিকেল উপভোগ করতে অমিতাভ অফিস ছুটির পর এসেছে বন্ধু মনোজের বাড়িতে। সেখানে মনোজের ঘরের সাজানো আসবাব, ছবি আর কেতকীর সুসজ্জিত বেশবাস সব মিলে যখন একটি চায়ের বিকেল সন্ধ্যার খুশিতে ঝলমল হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই কেতকী ওআর টাইমের সময় অফিসে মেয়েদের সাথে মনোজ কাজ করে কিনা জানতে চায় অমিতাভর কাছে। কেতকীর এই প্রশ্নে মুহূর্তে চায়ের বিকেলের পরিচ্ছন্ন পরিবেশে নেমে আসে কদর্যতা। তৎক্ষণাৎ অমিতাভ সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে।	ভাবপ্রধান
ব্লেড	সময়ের অভাবে একশো আশি টাকা মাইনের চাকুরে হিরণ্য সেদিন পুরনো ব্লেডেই দাড়ি কামিয়ে অফিসে বের হয়। ট্রেনে আসবার সময় তীব্র মানসিক অস্বস্তিতে দগ্ধ হয়েছে হিরণ্য। কিন্তু প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যেও সে ট্রামে উঠে একটি সীট পেয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই ভিড় ঠেলে এক লেডিজ যাত্রী উঠে এল ট্রামে। কণ্ডাক্টার বাজখাই গলায় লেডিজ সীট ছেড়ে দিতে বলল। তীব্র বিরক্তিতে সীট ছেড়ে দিয়ে হিরণ্য সেই মহিলা যাত্রীর প্রতি রসিকতা পূর্ণ	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	রুচিহীন কদর্য মন্তব্য করে । কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে দেখতে পেল লেডিজ সীটটায় মুখলাল করে অবনত মুখে বসে পড়েছে কুমারী শিখা ঘোষ । অফিসের নতুন সহকর্মী এই শিখা ঘোষের সাথেই ছুটির পরে একসঙ্গে চা খাবে বলে পুরনো ব্লেডে দাড়ি কামিয়ে হিরণ্য মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছিল । কিন্তু ট্রামে এই অভদ্র ব্যবহার করে সেই আয়োজন সে নষ্ট করে দিয়েছে । তীব্র আক্ষেপ নিয়ে সে বুঝতে পেরেছে, তার ব্লেড সত্যিই ভোঁতা হয়ে গেছে । শিখা ঘোষের জন্য তাকে আর রজনীগন্ধা কিনতে হবে না, ঘরের অশিক্ষিতা স্ত্রীর জন্যে কিনে নিতে হবে কুমড়ো ফুল আর ইলিশ মাছ ।	ভাবপ্রধান
পদধ্বনি	মৃত্যু চিন্তায় কাতর মিস্টার ঘোষাল মনে করেন তাঁর জীবনের দৌড় সংকীর্ণ হয়ে এসেছে । ঠিক এমন সময় তাঁর নবজাতপুত্র তাঁর কাছ থেকে অলিম্পিক মশাল তুলে নিয়ে আরেক জীবনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে । তিনি থেমেছেন, কিন্তু তাঁকে ছাড়িয়ে, তাঁর চেতনাকে ছাড়িয়ে তাঁর নবজাত শিশু এগিয়ে চলেছে । তারই পদধ্বনি শুনছেন মিঃ ঘোষাল ।	ভাবপ্রধান
অনুকল্প	অহংকারী ব্রজভূষণ দত্ত তাঁর মেয়ে মাধবীর সঙ্গে প্রাইভেট টিউটর নিরঞ্জনের বিয়ে দিতে রাজী নন । খালোহরি পালের সঙ্গেই দেবেন মেয়ের বিয়ে । নিরুপায় নিরঞ্জন তার মেসের সত্যানন্দর শরণাপন্ন হয় । চিরকুমার সত্যানন্দ মাধবীকে নিয়ে বয়ে মেলে নিরঞ্জনের পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন । কিন্তু তাদের বিদায় দিয়ে পয়তাল্লিশ বছরের ব্যায়ামের নিগড়ে গড়া সুঠাম দেহে অসুস্থতা বোধ করলেন সত্যানন্দ । অনুভব	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্শ্রেণীর ?
	করলেন তবু নিঃসঙ্গতা । ব্রোকার বিনয় মিত্রের কথা মনে পড়ল তাঁর । সময় এসেছে তাঁর কারো কাছে আশ্রয় নেবার । জীর্ণ দেহ নিরঞ্জনকে প্রতীক করে সত্যেনদা যেন নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের জন্যেই অর্ঘ্য খুঁজেছিলেন । কিন্তু নিরঞ্জন তার মাধবীকে বিদায় দিয়ে হঠাৎ তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন । ছুটে এলেন ব্রজভূষণ দত্তের কাছে । বললেন, নিরঞ্জন মাধবীকে নিয়ে বম্বে মেলে পালিয়ে যাচ্ছে । ট্যাক্সি নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে এস.এন. হালদার অ্যান্ড পার্টি লেখা কুপেই তাদের খুঁজে পাবেন ।	ভাবপ্রধান
চাবি	তিনদিনের জ্বরে হার্টফেলিয়োর করে গায়ত্রীর মৃত্যু হলে অহিভূষণ দুঃসহ শোক নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে । গায়ত্রী ছাড়া তার জীবনের সব শূন্য-সব অন্ধকার । কিন্তু স্কুল মাস্টার অনুপমবাবুর মেয়ে জয়া এই দুর্বহ শোকের মধ্যেও যখন টিফিন ও চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে এসে তাঁকে জামাকাপড় ছাড়তে বলেছে, চাবি দিয়ে তার ট্রাঙ্কের তালা খুলে দিয়েছে তখন গায়ত্রী বিহীন জীবনে জয়ার এই আবির্ভাব অহির মনে পরিবর্তন নিয়ে আসে । তার মনে হয়, শরীরের প্রতি অযত্ন করে এই কদিনে তার চেহারা বিশ্রী হয়ে গেছে ।	ভাবপ্রধান
সুধা আসবে	মায়ের সইয়ের মেয়ে সুধাকে স্টেশন থেকে আনতে গিয়ে সিতাংশু সুধার সাথে ছেলে বেলার শত্রুতা ভুলে যায় । দশবছরের ব্যবধানে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ছাত্রী সুধার বয়স উনিশ বছর - এইটিই ভাবী এম.বি.বি.এস সিতাংশুর কাছে তখন দরকারী খবর । তাই শীতের জোরে দুমাইল পথ হেঁটে এসেও সিতাংশুর ভালোই লেগেছে ।	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
প্রহরী	জোচ্চোর প্রতারক ননীগোপাল প্রাইভেট টিউটর হয়ে ছাত্রী মন্দিরাকে হাত করে নেয়। এ খবর জানতে পেরে মন্দিরার বাবা তাকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ননিগোপাল মন্দিরাকে কলকাতায় পালিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল। রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর ভুলুয়ার সতর্ক পাহারায় তাকে ফিরে যেতে হয়েছে। কিন্তু ভুলুয়া মন্দিরাকে ননিগোপালের হাত থেকে বাঁচালেও মিউনিসিপ্যালিটির হুকুমে মাত্র আট আনার লোভে ডোমের লাঠির আঘাতে ভুলুয়ার মাথা ছাতু হয়ে যায়।	চরিত্রপ্রধান
প্রঘাত	তারাপদ তার স্ত্রীর কাজকর্ম, স্বামীর প্রতি আনুগত্য সহনশীলতার প্রশংসা করলেও এই অশিক্ষিতা স্ত্রীর জন্যই তার দাম্পত্য জীবনে অসন্তোষ নেমে আসে। কিন্তু যেদিন অফিসের মাতাল সহকর্মী কাঞ্চন চৌধুরী তার স্ত্রীকে কুৎসিত অপমান করেছে, সেইদিনই তারাপদ জীবনে প্রথম স্ত্রীকে মর্যাদা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কোনো ভদ্রমহিলার সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেকথা তারাপদ বুঝিয়ে দেয় কাঞ্চন চৌধুরীকে।	ভাবপ্রধান
খুনী	নিজের বিবিকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ছ'মাস ফেরার থেকে খুনী মকবুল চোর হিসেবে ধরা পড়ে। কিন্তু তার হাড় জিরজিরে চেহারা, মা বলে কান্না আর চোখের জল দেখে মনে হয় মকবুল এক সাধারণ মানুষ। হত্যার অপরাধে ফাঁসির হুকুমের পর আসামী যখন	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
	আপীনে অস্বীকৃত হয়ে উকিলকে বলে তার বউ ছেলে মেয়েদের একটু দেখতে তখনও যেন মকবুলের কন্ঠেরই মতো প্রতিধ্বনি শোনা যায় । সুতরাং রাত্রির অন্ধকারে দুর্যোগের মধ্যে নৃশংস নির্মম সত্তার ছায়ামূর্তি হয়ে ঘুরে বেড়ায় যে খুনী তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না । কারণ খুনীও মা-স্ত্রী-সন্তান পরিবৃত একজন সাধারণ মানুষ ।	অবগুণ্ঠন
আকাশ	জানলার পাশে ইজিচেয়ারে বসে জয়ন্ত খোলা আকাশের দৃশ্য দেখত । ঘর সাজানোর জন্য পর্দা টাঙিয়ে এলা জয়ন্তর সেই আকাশকে ঢেকে দেয় । অফিস ফেরৎ জয়ন্তর তাই বাড়িতে মন বসে না । মনে পড়ে শ্যামবাজারে তপন সেনের বাড়ির নিয়মিত তাসের আড্ডা ।বাইরে খোলা আকাশ অথচ ঘরে জানলায় ভিয়েনিয়ামের পর্দা-ভাবতে - ভাবতে জয়ন্ত শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সি ডেকে শ্যামবাজারের দিকেই চলে যায় ।	অবগুণ্ঠন
টেস্টটিউব	অশোক সেনের ল্যাবরেটরীর টেস্টটিউবে ম্যালেরিয়া টিবি. ডি.ডি. টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের জীবাণু আর বৃদ্ধ রোগীর কাশি জীবনের বিবর্ণতা বয়ে আনে । কিন্তু পাশাপাশি সুইটপীর গন্ধ , আশ্চর্য বেড়াল স্টেলা ও লাল চটি পরা মেয়ে কবিতা জীবনের অর্থ খুঁজে নেবার কথা ভাবায় । কাব্যবন্ধু ডাক্তার অশোক সেনের ল্যাবরে-টরীতে ব্লাড দিতে এসে আশুতোষ রায় ভাবলেন কাচের র‍্যাকের সারি সারি টেস্টটিউবে টি.বি - ডি-ডি	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
প্রতিপক্ষ	দু চারখানা রেকর্ড বের হবার পর ইন্দু গানে বেশ সুনাম অর্জন করে । শিখার সাথে বিয়ের পর সুর আর প্রেম তাদের দুজনের জীবনের আকাশ ভরে ওঠে। শিখা গান গাইত রেডিয়োতে । তার ইচ্ছে ছিল গ্রামোফোনে ডুয়েট গাইবে । কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানী তাতে আপত্তি তোলে । সরস্বতী পূজোর আসরে , অফিসে , কলেজ সোশ্যালে ও জলসায় এ ক্লাস আর্টিস্ট ইন্দুরই ডাক পড়ে , শিখার নয় । সর্বত্রই ইন্দু অনুষ্ঠানের পর নিজের ব্যাগ থেকে পার্টির নাম করে মিথ্যে টাকা দিয়ে শিখাকে সন্তুষ্ট করে । কিন্তু একদিন একটি বড় জলসার আসর শেষ করে দুজনে যখন গাড়িতে ওঠে তখন শিখা তার নামে কটূক্তি শুনে পরাজয়ের অপমানে লজ্জায় ও কান্নায় ভেঙে পড়ে । গানই ইন্দু ও শিখার মাঝখানে প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিল । কিন্তু ইন্দু গানের চাইতে শিখাকে ভালোবাসতো বেশী । তাই এরপর থেকে ইন্দু গান ছেড়ে দিয়ে হন দোকানদার। শিখাও হন কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষিকা , গানের টিচার নয় ।	ঘটনাপ্রধান
মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু	একটি ছাত্রের আশা ছিল ভবিষ্যৎ জীবনে সে মানুষের মতো মানুষ হবে । আগামী ভারতবর্ষের ভিত্তি রচনা করবে । মাইনর স্কুলে স্কলারশিপ পেলেও অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে পড়াশুনা করে সে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় থার্ড ডিভিশনে পাশ করেছে । তার বই কেনার টাকা ছিল না । বড়গঞ্জের হাইস্কুলে পড়বার সময় ধানচালের আড়তদার সামন্তদের বাড়িতে চিঠিপত্র , খাতা ও হিসেব লিখে দিয়ে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল । কলেজে পড়বার	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
	সময়ও সম্প্রদের আত্মীয় বড়বাজারের তামাক ব্যবসায়ীর আশ্রয়ে থেকে সেখানকার বদ্ধ পরিবেশ, গুমোট গরম, দীঘির নোংরা জল, তামাক আর গুড়ের গন্ধে তার জীবনের সব স্বপ্ন শুকিয়ে যায়। তামাকের দোকানে খাতা লেখার পরিবর্তে সরকার কর্তা তার পরীক্ষার ফী দিলেন, কিন্তু বইয়ের অভাবে তার পড়াশুনা হয় নি। তাই পরীক্ষার খাতায় বর্ষবঞ্চিত দরিদ্র ছাত্রদের প্রতিনিধি স্বরূপ এই সমাজ ব্যবস্থার প্রতি প্রতিবাদ জানিয়ে পরীক্ষকের কাছে চিঠি লিখে সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।	ঘটনাপ্রধান
কান্ডারী	অখিল অলকাকে বিয়ে করে ভালোবাসা পায়নি। কারণ তার বয়স আটচল্লিশ, অলকার তেইশ। সুস্থ স্বাভাবিক চরিত্রবান দূর সম্পর্কের দেবর প্রতাপকে অলকা প্রশ্রয় দেয় না, কিন্তু চেহারায় আচারে ও বয়সের তফাতে সে অখিলকে ঘৃণা করে। অখিলও একথা ভালোই বুঝতে পারে। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ী পথে যখন তাদের জীপ অ্যাকসিডেন্টের সম্মুখীন হয়েছে এবং চায়ের বাক্স বোঝাই লরির নেপালী ড্রাইভার প্রতাপকে যাত্রা বলেছে তখন অলকা প্রতাপকে আনাড়ী মনে করে গাড়ির স্টিয়ারিং অখিলের হাতেই তুলে দেয়। বিপন্ন মুহূর্তটিতে অখিল ও অলকার মধ্যে দূরত্ব ঘুচে যায় ও এক অপরকে কাছে টেনে নেয়।	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোনশ্রেণীর ?
একজিবিশন	দুবার আই.এ. ফেল করে কালিমার অত্যাচারে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চেয়েও চম্পা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। রূপবতী চম্পা ইচ্ছে করেছিল বম্বে গিয়ে ফিল্মে নামবে। পরিবর্তে দুজন সখীর প্রতারণায় নাগপুরে তার দেড়বছর কেটে যায়। কিন্তু সেখানে প্রতি রাতে মাতাল পশুদের সাথে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে সে একদিন পালিয়েছে। তারপর থেকে রোজ রোজ তার মনিব বদলেছে। একজিবিশনের মেলায় সেই বিপথগামী মেয়েটির সাথে গল্পের নায়ক বসন্তর পরিচয় হয়। মেয়েটি তার বিগত জীবনের দুঃখের কাহিনী বলে বসন্তকে অভিভূত করে। বসন্ত তাকে উদ্ধার করবার জন্য কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করবে বলে। কিন্তু চম্পা তাতে একটুও অবাক হয় নি। কারণ এর আগে আরও তিনজন তাকে এই ভাবেই ঠকিয়েছে। তবু চম্পার হাত বসন্ত মুঠির মধ্যে ধরে রাখে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ফলে একজিবিশনের কয়েকহাজার মানুষ গেটের দিকে অন্ধের মতো ছুটে আসতে থাকে। আর তখনই বসন্তর মুঠি থেকে খুলে যায় চম্পার হাত। হাজার লোকের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে যায় চম্পা। তাকে বাঁচাতে বসন্ত জীবনের ঝুঁকি নিল না এবং এর ফলে চম্পার জীবনে আর তিনজন পুরুষের চেয়ে বসন্ত কোনো ব্যতিক্রম হল না।	ঘটনাপ্রধান
অমনোনীতা	দুলাল চৌধুরীর সাথে মণিকার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। সুখেন্দুর কাছে একথা শুনে লোকেন অস্বস্তিতে ভুগেছে। এই কারণে রাতে তার ঘুম হয় নি। কিন্তু মণিকাকে সে ছোট করে দেখতে পারেনি। মণিকা নিজেই লোকেনকে বলেছে, দুলাল	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোনশ্রেণীর ?
একজিবিশন	দুবার আই.এ. ফেল করে কালিমার অত্যাচারে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চেয়েও চম্পা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। রূপবতী চম্পা ইচ্ছে করেছিল বম্বে গিয়ে ফিল্মে নামবে। পরিবর্তে দু'জন সঙ্গীর প্রতারণায় নাগপুরে তার দেড়বছর কেটে যায়। কিন্তু সেখানে প্রতি রাতে যাত্রার পশুদের সাথে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে সে একদিন পালিয়েছে। তারপর থেকে রোজ রোজ তার মনিব বদলেছে। একজিবিশনের মেলায় সেই বিপথগামী মেয়েটির সাথে গল্পের নায়ক বসন্তর পরিচয় হয়। মেয়েটি তার বিগত জীবনের দুঃখের কাহিনী বলে বসন্তকে অভিভূত করে। বসন্ত তাকে উদ্ধার করবার জন্য কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করবে বলে। কিন্তু চম্পা তাতে একটুও অবাক হয় নি। কারণ এর আগে আরও তিনজন তাকে এই ভাবেই ঠকিয়েছে। তবু চম্পার হাত বসন্ত মুঠির মধ্যে ধরে রাখে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ফলে একজিবিশনের কয়েকহাজার মানুষ গেটের দিকে অন্ধের মতো ছুটে আসতে থাকে। আর তখনই বসন্তর মুঠি থেকে খুলে যায় চম্পার হাত। হাজার লোকের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে যায় চম্পা। তাকে বাঁচাতে বসন্ত জীবনের ঝুঁকি নিল না এবং এর ফলে চম্পার জীবনে আর তিনজন পুরুষের চেয়ে বসন্ত কোনো ব্যতিক্রম হল না।	ঘটনাপ্রধান
অমনোনীতা	দুলাল চৌধুরীর সাথে মণিকার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। সুখেনের কাছে একথা শুনে লোকেন অস্বস্তিতে ভুগেছে। এই কারণে রাতে তার ঘুম হয় নি। কিন্তু মণিকাকে সে ছোট করে দেখতে পারেনি। মণিকা নিজেই লোকেনকে বলেছে, দুলাল	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্‌শ্রেণীর ?
	চৌধুরীর কাছে সে অপনোনীতা । তাছাড়া দুলাল চৌধুরী অ্যাকসিডেন্ট মারা গেছে , তবুও তার অস্তিত্বের কথা ভেবে লোকেন তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছে ।	ঘটনাপ্রধান
মিনটি	বিনামূলধনে বাড়ি আর জমির দালালি করে উপার্জন করলেও হিমাংশু ঘোষাল তার সুন্দরী স্ত্রীকে (গৌরীকে) গলার চুড়ি ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে নি । সামনের ট্রানজ্যাকশনের টাকা পেলেই সে গৌরীকে গয়না পরাবে বলে আশ্বাস দেয় । গৌরীর গলার মিনটির হার ও যেন তার কাছে লজ্জা । যারা তাকে ঠকিয়েছে হিমাংশু তাদের উপর প্রতিশোধ নেবে । শেষ পর্যন্ত একশো টাকাকে তিনশো টাকায় পরিণত করতে গিয়ে জুয়ার আসরে সব হারিয়ে পকেটে মাত্র সাত আনা পয়সা নিয়ে রাত বারোটায় সে গলিতে পা দেয় । কিন্তু টাকার লোভে গুণ্ডারা তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধোর করতে থাকে । টের পেয়ে গৌরী এসে তার গলার হার গুণ্ডাদের হাতে তুলে দেয় । গুণ্ডারা হিমাংশুকে ছেড়ে চলে যায় । হিমাংশু জানত হারটি মিনটির , কিন্তু আসলে তা মিনটির ছিল না , হিমাংশুর ভালোবাসাই ছিল মিনটি করা ।	চরিত্রপ্রধান
আতিথ্য	কাশীর হিন্দু ইউনিভার্সিটির কে.পি. ভোরবেলায় গঙ্গা স্নান করতে এসে পা পিছলে জলে পড়ে যায় । আর.এন. তাঁর প্রাণ বাঁচায় । তারপর থেকে দুজনে বেশ অন্তরঙ্গতা ।	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্‌শ্রেণীর ?
	কে.পি.আর. এনকে নিমন্ত্রণ করেছিল তার দেশে বেড়াতে যেতে । আর.এন. কে.পি.র জীবন কালে তা রক্ষা করতে পারেনি । কিন্তু মহালেফটন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় কে.পি.র মৃত্যুর পর আর.এন সৈন্যদলে যোগ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কে.পি.রই গ্রামের কাছে এসেছে । কিন্তু সৈনিকেরা যখন নৃশংসভাবে গ্রাম আক্রমণ করে মেয়েদের উপর পৈশাচিক তাণ্ডব চালিয়ে ফিরে আসে তখন আর.এন. বুঝতে পারে - এইটিই হল কে.পি.র গ্রাম । কে.পি.র কাছে শোনা তার গ্রামের মাঠঘাট, শিবমন্দির পাহাড়ের গায়ে অর্জুন আর শালের বন সবই মিলে গেছে। এই গ্রামেই আর.এন. এর জন্যে অপেক্ষা করেছিল কে.পি.র মায়ের হাতের চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের খাবার, আশীর্বাদ আর বোনের হাতের ভাইফোঁটা । এই গ্রামেরই একটি মেয়েকে ভালোবাসত কে.পি । অথচ এই গ্রামের প্রতি কি দুর্ব্যবহার করেছে সে । দুঃখে লজ্জায় আর.এন. আত্মহত্যা করতে গিয়েও ব্যর্থ হয় । মাঝে মাঝে এই দুঃস্বপ্ন যখন তাকে অধীর করে তোলে তখনই জাপানী সৈনিকের মতো হ্যাণ্ডগ্রেনেড দিয়ে সে আত্মহত্যা করতে চায় ।	ঘটনাপ্রধান
মধুকুন্তী	দণ্ডনগরে ইনস্যিয়োরেন্সের পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়িতে চা খেতে এসে দক্ষিণের বারান্দার বসন্তের হাওয়ায় ঝাউয়ের পাতায় মৃদু মর্মর, ভদ্রলোকের বিদুষী গুণবতী স্ত্রীর সেতারের মধুকুন্তী রাগ বারো বছর আগে যতীনকাকার মেয়ে জয়াকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা চিত্তকে মনে করিয়ে দেয় । তাই স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাত্রির অন্ধকারে সাপ বাঘ বুনো শুয়োর খুন আর ডাকাতের ভয়কে মর্গ করে জলাজমি আর বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে চিত্ত এসে দাঁড়ায় যতীনকাকার বাড়ীতে । কিন্তু	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	ঋণমুক্ত	কোন্ শ্রেণীর ?

যতীনকাকা তাকে বসতে বলেননি । জয়া তাকে থাকতে বলেনি , চলে আসার সময় কঠিন স্বরে তাকে খালি পার করে দিয়েছিল । বারো বছর আগে একদিন চিত্ত জয়াকে এই খালি পার করে দিয়েছিল । এবারেও বিদায় নেবার সময় জয়া তাকে প্রণাম করে । সেই মুহূর্তে চিত্তর মনে হয়েছিল তার হাতখানা বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে কিছু বলবে । কিন্তু হঠাৎ কুকুরের কর্কশ ডাকে সেই মুহূর্তটি নষ্ট হয়ে যায় । জয়া উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই ফিরে চলে যায় । মূল্যবান মুহূর্তটি কাজে না লাগিয়ে চিত্ত জয়াকে হারাল , কিন্তু সে স্থির করে দত্তনগরের ভদ্রলোকের বাড়িতে দক্ষিণের খোলা বারান্দায় বসে সেতার শুনতে শুনতে সে জয়ার কথা ভাবতে থাকবে । ভাবপ্রধান

দাম কলেজের অধ্যাপক সুকুমার তার স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাইকে নিয়ে গল্প লিখেছে । কর্তৃপক্ষ এ জন্যে তাকে দশ টাকা দক্ষিণাও দিয়েছেন । পরবর্তীতে বাংলাদেশের একটি কলেজে বক্তৃতা করতে এসে সুকুমার আকর্ষণীয় বক্তৃতায় সবাইকে মুগ্ধ করে । এদিকে এক বুড়ো ভদ্রলোক তাকে অভিনন্দন জানাতে মাঠে অপেক্ষা করছেন । সুকুমার তার সাথে দেখা করে প্রণাম করে । বুড়ো ভদ্রলোক তাকে আশীর্বাদ করলেন । এই বুড়ো ভদ্রলোকই ছিলেন সুকুমারের স্কুল জীবনে অঙ্কের মাস্টারমশাই । সুকুমার তাঁকে নিয়ে গল্প লিখেছে , একটি জীর্ণ পত্রিকায় সেই গল্প তিনি গর্বের সঙ্গে বুকে ধরে রাখেন এবং সবাইকে সেকথা বলেন । একবার আনন্দে তিনি সুকুমারকে চিঠি লিখেছিলেন , কিন্তু পাঠাতে সাহস করেননি । কথা বলতে বলতে সেদিন মাস্টারমশাইর চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে । ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	এই ঘটনায় সুকুমার স্নেহ, মমতা, দয়ার এক মহামনুষ্যত্বের দ্বারে দাঁড়িয়ে দশ টাকার বিনিময়ে সেই গল্পটি পত্রিকা বিভাগকে বিক্রয় করে মাস্টারমশাইকে ছোট করেছে ভেবে লজ্জা বোধ করে।	
রাণীর গল্প	রাজা মেম বিয়ে করে বিলেতে বাস করেন বলে রাণী এক কোটিপতির বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এসেছেন। দামী ফার্নিচার, ক্রীম রঙের মোটর তার আভিজাত্যের নিদর্শন। পাড়ার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মেয়েরা এসে রাণীর কাছে পাঁচশো টাকা সাহায্য চায়। রাণী পাঁচশোর পরিবর্তে লিখে দেন পাঁচ হাজার। কিন্তু চেক লিখেই অসহ্য যন্ত্রণায় রাণী হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন। সেই রাতেই হাসপাতালে রাণী মারা গেলেন। আসলে রাণী একমাস ধরে অনাহারে ছিলেন। তাঁর মোটর, ফার্নিচার সব ছিল ভাড়া করা, মেয়েদের জন্য খাবারও এনেছিলেন বাড়িতে। আত্মমর্যাদারক্ষার জন্য মিথ্যের ভার বহন করতে পারেননি রাণী, তাই এইভাবেই তিনি মারা গেলেন। এমনি করেই যেন রাজারাণীরা লুপ্ত হয়ে যায়।	চরিত্রপ্রধান
গলি	স্কুল মাস্টার অজিত সুমিত্রাকে ভালো বেসেছিল, কিন্তু বিয়ে করতে পারেনি, এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে হয়েছিল। তার মাঝে প্রতিযোগিতায় থার্ড ক্লাস এম.এ স্কুল শিক্ষক অজিত পরাজিত। অজিত যে মেসে থাকত চৌদ্দ বছর আগে সেই মেসেরই একটি ছেলে উত্তর কলকাতার অট্টালিকার ছায়া-ঘেরা এক নির্জন গলির অন্ধকারে খুন হয়েছিল। টিউশন সেরে অজিত সেই গলি দিয়ে সোজা পথে মেসে ফিরে আসত। ক্লাস, টিউশন, খাতা দেখা এসবের মধ্যে ব্যস্ত থাকলেও অজিত সেই	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	গলির বীভৎস খুনের দৃশ্যের কথা ভেবে ভয় পেত। সাইকোঅ্যানালিস্টকে দেখাতে চেয়েও নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ভেবে সে আর সাহস করেনি। স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে মাস খানেকের জন্য সে কলকাতার বাইরে যাবে বলে মনস্থ করেছিল। কিন্তু বাগবাজারের মল্লিকার কাছ থেকে সে ছুটি নিতে পারেনি। অজিত মল্লিকাকে পড়াত। জন্মদিনে মাস্টারমশাইকে কাছে পায়নি বলে ওর ভালো লাগে নি। এই মল্লিকার মধ্যেই অজিত খুঁজে পেল সুমিত্রাকে। আইভির ছায়া-ঘেরা গলির খুনের দৃশ্যও মুছে গেল তার মন থেকে। মল্লিকা তার জীবনে আবার নতুন শান্তি, মধুদুর্ঘর একরাশ বকুল অরণ্যমনুষ্যনাকে ফিরিয়ে আনল। কিন্তু অজিত জানে মল্লিকাও একদিন সুমিত্রার মতো সরে যাবে তার জীবন থেকে। তবুও অজিত আর ভয় পাবে না, কারণ সে বুঝেছে ক্ষীণ গলির মলিন দুঃস্বপ্নের চেয়ে জ্যোৎস্নার বকুল, ঘাসের পাতার গান অনেক বেশি সত্য।	ভাবপ্রধান
রাওয়ালপিণ্ডি	দেশে থাকার সময়ে যে রাওয়ালপিণ্ডি গল্পের বক্তাকে আদর যত্ন করে খাওয়াতেন, উপনয়নের সময় যিনি প্রথম ভিক্ষে দিয়েছিলেন, টাইফয়েডের সময় বুক চিরে বেলপাতায় রক্ত-মাখিয়ে অঞ্জলি দিয়েছিলেন কালীবাড়িতে তাঁরই ছেলে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্যে পনের টাকা সাহায্য চেয়ে তাঁর কাছ থেকে ফিরে গিয়েছে। বক্তা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন কারণ স্কুল মাস্টারি, টিউশনি করে তাঁর সংসারেও দারিদ্র কাটেনা। অভাবের কারণেই তাঁর স্ত্রী সেলাই করা শাড়ী পরে আর ম্যালনিউট্রিশনে ভোগে। ছেলেটিকে তিনি	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	ফিরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু রাজবালাপিসিমা পরদিন সকালে ছেলেটিকে দিয়েই তার জন্যে মাটির ভাঁড়ে দুধ, একছড়া কলা ও দুটো পাকা পেঁপে পাঠিয়েছেন।	চরিত্রপ্রধান
চতুর্থ রোগ	সুকুমার অধ্যাপক আর জীবেশ জার্নালিস্ট। কিন্তু দুজনেই মল্লিকের পত্নী প্রশস্তি সইতে পারে না। জীবেশ তার অগ্নীর কাছে মল্লিকের স্ত্রী জ্যোৎস্নার আদি জীবনের কাহিনী শুনে সুকুমারকে চিঠিতে জানিয়েছে - জ্যোৎস্না কলেজে পড়ার সময় জনু ঘোষ নামে এক ছোকরার খপ্পরে পড়েছিল। জনু ঘোষ জ্যোৎস্নাকে প্রেমপত্র দিয়েছিল। এই কারণে প্রিন্সিপাল জ্যোৎস্নাকে ডেকে শাসন করেন। লজ্জায় জ্যোৎস্না জনুকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। ধরা পড়ার পর তার বাবা তাকে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মল্লিক এই জ্যোৎস্নাকে বিয়ে করে অজন্তার আশীর্বাদে স্ত্রীর গুণকীর্তন করেছে।	ঘটনাপ্রধান
আমার কথা	মল্লিকের কথা রাখতে জ্যোৎস্নার হাতের পিঠে, পোলাও খেতে গিয়ে সুকুমার দেখে জনু ঘোষ (জয়ানন্দনামে) মল্লিকের চাকর। জ্যোৎস্নাকে সে মা বলে ডাকে। মুখের কথা পড়তেই সে মল্লিকের জুতো ঘরে তুলে আনে। সুকুমার ভাবে, জ্যোৎস্নার অনুরোধেই হয়তো মল্লিক সাধ করে পুষছে ঘরে। হয়তো জনু এই ছদ্মবেশ নিয়ে কুটিল প্রতিহিংসাকেই চরিতার্থ করছে কিংবা মল্লিকের পত্নী প্রশস্তি হয়তো তার স্ত্রীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণেরই ছদ্মবেশ।	চরিত্রপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
আফ্রোদিতে	শহরের শেষ প্রান্তে নির্জন বাড়িতে চার বন্ধুতে মিলে তাস খেলে গল্পগুজব করে রোজ সময় কাটায়। সামনের দোতলা বাড়ির কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে কণিকাকে নিয়ে তাদের মধ্যে রোমান্টিক পরিবেশ ঘনিয়ে ওঠে। কিন্তু হঠাৎ করে কণিকার আত্মহত্যা ও চিঠি দেখে তারা ভাবে মেয়েটির মৃত্যুর জন্যে তারা সবাই দায়ী। কারণ মেয়েটিকে তারা কালেকটিভ ওয়ারশিপার রূপেই দেখেছিল। মেয়েটির আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে যেন তাদের কাছ থেকে সমুদ্রপারের গ্র্যানিট মন্দিরের আফ্রোদিতের সোনার মূর্তিটি ভেসে গেল।	ভাবপ্রধান
সমবেদনা	পাহাড়ী স্টেশনের কাঠের ছোট বাড়িতে ছোটো - লাইনের রেলকর্মচারীর স্ত্রী উমার সাথে এক দুপুরে সেলাই কলের রিপ্রেজেন্টেটিভ অনিমা চক্রবর্তীর কথোপকথনের মাধ্যমে ঘনিষ্টতা সৃষ্টি হয়। উমা অনিমাকে যত্ন করে খাওয়ায়। বিকেলে বিদায় নিয়ে অনিমা রেলজংশনে চলে আসে। আর উমা অনিমার বিশ্রামবিহীন যাযাবরী জীবনের কথা ভেবে দুঃখবোধ করে। কিন্তু তারপরেই অতিকায় প্রাচীরের মতো পাহাড় ঘেরা ছোট স্টেশনের ঘরটিতে স্বামী ও ছেলের অনুপস্থিতিতে নিজের জন্যই আতঙ্কে তার রক্ত জমে আসে।	ভাবপ্রধান
সাদা	এম.এ পাশ স্বামী মনোতোষের কেরাণীগিরির চাকরীর আয়ে অসন্তুষ্ট রমলা গাড়ি, বাড়ি সৌখিন জিনিস করার স্বপ্ন দেখে। ছেলেবেলার বান্ধবী গীতার আই.এ. পাশ করা বরের উপার্জনের সাথে তুলনায় মনোতোষকে সে ছোট করেই দেখে। কিন্তু প্রশান্ত দত্ত রায় নামে মনোতোষের এক বন্ধু তাদের	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	বাড়িতে এসে ব্যবসা বা কনট্রাক্ট নিয়ে বড় হওয়ার পর প্রতারণা ও অসততা লক্ষ্য করে রমলা পুনরায় মনোতোষকে গ্রহণ করে নেয়।	চরিত্রপ্রধান
আপার ধার গলা	নৌকো ডুবিতে কমলের বাবার মৃত্যুর পর তার মা তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসে বহু কষ্টে মানুষ করেছেন। কমল চাকরী পেয়েছে। তবুও তার মা ঘরবাড়ি, সংসার আর চারিদিকের নানা ভাবনায় ব্যস্ত থেকে গয়া-কাশী-নীলাচল কোনো তীর্থ দর্শনে যেতে পারেননি। কিন্তু একদিন ট্রাঙ্ক খুলে একটি পুরনো চিঠি পড়ে তার মায়ের কেমন ভাবান্তর হয়ে যায়। সেই রাতেই কমলের সঙ্গে তার মা যান পার্কে। দেশের বাড়ির কোনো স্মৃতি তাঁকে কিশোরী জীবনের মধ্যে ফিরিয়ে এনে পুকুরে জলে সাঁতার কাটতে নামায়। পরের দিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে পাশের বাড়ি মেয়ে রুনির সঙ্গে তাঁর মা কমলের বিয়ে পাকাপাকি করেছেন। কমল মাকে হারায়, কিন্তু রুনির মধ্যে যেন তার হারানো মায়ের কণ্ঠস্বরই শুনতে পায়।	ভাবপ্রধান
দ্বিতীয় শরীর	হেড মিস্ট্রেস সুধা সেনগুপ্ত তাঁর কলেজের সহপাঠিনী শ্যামলীকে অ্যাসিস্টেন্ট টিচার এর চাকরীতে নিয়োগ করেছিল। সুধার কোয়ার্টারেই থাকত শ্যামলী। সুধা ওকে খুব ভালোবাসত। কিন্তু যোগ্যতা ও পদমর্যাদার মধ্যে ব্যবধান তৈরী করে মনে মনে ব্যথিত হয়েছে শ্যামলী। কিন্তু সুধা কলকাতা থেকে বিয়ে করে কোয়ার্টার্সে ফিরে এলে কলকাতা থেকে সুধার এম.এ. পাশ বরের চিঠি আসতে থাকে। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে সে চিঠি শ্যামলী পড়ত। এইভাবে মিস্টার মিত্রর প্রতি তার অনুরাগ জন্মা।	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	মিঃ মিত্র আসবেন জেনে সুধা সেক্রেটারীর গাড়ি নিয়ে স্টেশনে গিয়েও ফিরে আসে, কারণ জরুরী কাজে আটকে মিঃ মিত্র আসতে পারেন নি। এদিকে তাঁর আসার খবর শুনে শ্যামলী খুব করে সাজে। সুধা ফিরে এসে তাকে দেখে হেসে ওঠে। আসলে শ্যামলী মনে মনে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল। সেদিন বিষণ্ণতা কাটাতে সুধা মেতে টীচার্স মেসে, আর শ্যামলী সুধার কাছে, পৃথিবীর কাছে, নিজের কাছে লজ্জিত হয়ে এক মাসের ছুটির দরখাস্ত দিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনেই কলকাতা চলে যায়।	ভাবপ্রধান
রাজপুত্র	দুর্দান্ত জমিদার মনুজেন্দু নারায়ণের বংশধর প্রতাপেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বন্ধু মহলে রাজপুত্র বলে পরিচিত। কিন্তু তাঁদের জমিদারী ও রাজকীয় গৌরব অবলুপ্ত। তাই বেলেঘাটার একতলা ভাড়াটে বাড়িতে থেকে টিউশনি করে প্রতাপ বি.এ. পাশ করে। পরবর্তীতে দার্জিলিংয়ে চাকরী করতে এসে স্কুল টীচার মাধবীকে ভালোবাসে প্রতাপ। কিন্তু মাধবীকে গীতবিতান কিনে দেবার মত সামর্থ্য তার নেই। অবশেষে তার মায়ের দেওয়া তিনপুরুষ আগের নাগপাথরের আংটি ট্রাংক থেকে বের করে তার পরিবর্তে প্রতাপ গীতবিতান কেনে। আগে এই আংটিটা মূল্যবান পাথরটির স্থানে কমলহীরে বসানো ছিল। দেনার দায়ে তা অনেক আগেই বিক্রী করা হয়েছিল। এবারে আংটিটি বিক্রয়ের সময় রাজবংশের শেষ আংটিটার শেষ আলোয় জ্বলে ওঠে প্রতাপের মুখ। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বিলিতি ফ্যাশানে অভ্যস্ত প্রতাপের বন্ধু বীরেশ ও তার স্ত্রী শীলা কিনে নিতে চায় সেইগীতবিতানটি। প্রতাপ রাজী না হলেও মাধবী স্ত্রীলোকেই	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	বইটি উপহার দেয়। প্রতাপ এতদিন রাজপুত্র বলে পরিচিত ছিল, এই ঘটনায় মাধবী তাকে তার রাজা করে নিল। কমল হীরের আংটি ও গীতবিতান দুটোই হারালো প্রতাপ, কিন্তু মাধবীর চোখে তার আকাশের তারা কমল হীরে আর গীতবিতানের গান হয়ে উঠল। অন্তবিহীন অশ্রু ধারায় যেন সেই গান সুর বাঁধছে।	
এক অঞ্জলি ঘরে	পাঁচশো টাকার লোভে পাটোয়ারী পিতৃমাতৃহীন ভট্টাচার্য্যের তেরো বছরের সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে বিলের জলে নৌকো ভাসায়। তার বউ ছেলে মেয়ে মেয়েটিকে আদর করবে, সে তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবে, ট্রামে বাসে চড়াবে, যাদুঘর - চিড়িয়াখানা দেখাবে — এই সব লোভ দেখিয়ে পাটোয়ারী মেয়েটিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দাঁড় টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে পাটোয়ারী নৌকো তুলে দেয় ডুবো বাবলা গাছের ওপর। তাতে নৌকো ডুবে যায়। তবুও লোভী পাটোয়ারী মেয়েটাকে চুলে ধরে টেনে ত্রিশ হাত দূরের একফালি ডাঙায় নিয়ে আসে। কিন্তু সেখানে চারদিকে অসংখ্য বিষাক্ত সাপের মাঝে মেয়েটা শুয়ে থাকে। এই বিপদের মধ্যেও পাটোয়ারী কোমর পরীক্ষা করে দেখে টাকার পোঁটলাটা ঠিক আছে কিনা এবং তারপর বিলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। মেয়েটা মৃত্যুর চেয়েও গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ে।	চরিত্র-প্রধান
সুন্দর পাত্রী	মহেশবাবুর মেয়ে অর্চনাকে দেখতে এসে বন্ধুরা পাত্রী অর্চনার কথাবার্তা ও ব্যবহারে বেপরোয়া ভাব ও নির্লজ্জতার পরিচয় পেলেও পাত্র মুকুন্দ কিন্তু মনে মনে অর্চনাকেই পছন্দ করে বসে। অর্চনা মেধাবী, দারিদ্র্য আর সংসারের চাপে সে বি.এ. পাশ করতে পারেনি। কিন্তু মুকুন্দ বিয়ের এক বছরের	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	মধ্যেই তাঁকেডিস্টিংশনে বি.এ. পাশ করিয়ে নেয়।	চরিত্রপ্রধান
মর্যাদা	পণ্ডিত মশাইয়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গেলেন ও তার স্ত্রী উমা শেয়ালদা মার্কেট থেকে পনের টাকার তরকারী, মাছ, মিষ্টি নিয়ে পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়িতে আসে। কিন্তু পণ্ডিত মশাইয়ের ভাড়াটে বাড়িতে দুঃসহ দারিদ্র, অবিবাহিতা শীর্ণা মেয়ে, মাথানী রোগক্লিষ্টা স্ত্রীর কষ্ট ছাপিয়ে পণ্ডিত মশাইয়ের হাসিমুখ, স্নেহরসসিক্ত সুন্দর ব্যবহার দেখে উমা অপমানে কেঁদে ওঠে। পনের টাকার বাজার করে তারা চেয়েছিল ওঁদের উপকার করবে, কিন্তু মর্যাদা রক্ষার জন্যে যখন পণ্ডিত মশাইয়ের স্ত্রী নিজে গিঁট দেওয়া ছেঁড়া কাপড় পরেও উমাকে পঁয়ত্রিশ টাকা দামের শাড়ি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন তখন মধ্যবিত্তের আত্মমর্যাদা রক্ষার ভয় ছাপিয়ে গরীবের আত্মমর্যাদা বোধ এত তীব্র হয়ে ওঠে যে তা দেখে উমা অবাক হয়ে যায়।	চরিত্রপ্রধান
কে সে লোকটা	আলের উপর মাথা রেখে মাঠের জল কাদায় শরীর লেপটে একটা লোক মরে পড়েছিল এবং একটু দূরেই এক গাছা ছেঁড়া দড়ির মতো মরে পড়েছিল একটা কালো আলকেউটে। এই আল-কেউটের ছোবলেই লোকটি মরেছে। মরবার আগে সে সাপটিকেও শেষ করে গেছে। সুবল, সুখলাল, শম্ভু ও লোচন মাঠে এসে মড়াটাকে দেখে চিনতে চেষ্টা করে কিন্তু পারেনি। অবশেষে তারা বুঝতে পারে, লোকটা পাদন অথবা বিশু মণ্ডলের জামাই কিংবা চোর-ডাকাত কিছুই নয়, ওদের মতোই একজন চাষী। তাদেরই মতো সাংসারিক কোনো দুঃখে হয়তো ঘরছাড়া হয়েছিল। বাড়ি	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	ফিরে অন্যমনস্ক ভাবনার গভীরে ডুবে থেকে সুবল তার স্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে বলেছিল, ঐ লাশ তার নিজের, তাদের সকলের।	
অবক্ষয়	প্রমীলা চৌধুরী অফিসে কাজ করত। একদিন অফিসেরই এক সহকর্মী তাকে সুধাংশুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। সুধাংশু জার্নালিস্ট, পলিটিশ্যান ও এডুকেশনিস্ট। স্কুল মাস্টারী করে আর মাঝে মাঝে অর্থনীতির প্রবন্ধ লেখে। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের সুধাংশুর বিয়াল্লিশ বছরের শ্যামলা চেহারার প্রমীলাকে দেখে ভালো লাগে। সুধাংশুর ব্যক্তিত্ব, ছন্নছাড়া ভাব, প্রতিভাবানের মতো প্রশস্ত কপাল আর ভরাট গলার সুরে প্রমীলা মুগ্ধ হয়। তারপর একদিন তাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে যায়। রেজিস্ট্রির পর ফুলশয্যার রাতে মনে অনেক স্বপ্ন, অনেক রোমাঞ্চ নিয়ে প্রমীলা যখন দেখল উপার্জনহীন সুধাংশু তার পঞ্চাশ বছরের ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন প্রমীলার মনে প্রশ্ন জাগে - বুঝি পঞ্চাশের ছন্নছাড়া জীবন কাটিয়ে সুধাংশু এখন তার টাকায় আরাম করবার জন্যে, দার্জিলিংয়ে বেড়ানোর জন্যে কিংবা পাখির খাওয়া খাওয়ার জন্যে তাকে বিয়ে করেছে। তার মনে পড়ে - চৌদ্দ বছর বয়সে প্রমীলা তার হার, চুড়ি, আংটি আর জমানো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সুধীদাকে বিলেত যাওয়ার জন্যে সে সাহায্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু সুধীদা বিলেত না গিয়ে গার্ড হয়ে দানাপুরে গিয়ে বিয়ে করেছিল।	ভাবপ্রধান
...লন চাপার বৃন্ত	একদিন যে কবির কবিতা পড়ে গল্পের বক্তার মন ফুটে উঠেছিল সূর্যমুখীর মতো, সাবিত্রীকে ভালো বেসেছিলেন তিনি.	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	ভালোবেসেছিলেন জীবনকে, প্রৌঢ় বয়সে সেই কবিই সরকারের কাছ থেকে লিটারারী পেনসনের টাকা পাওয়ার জন্যে তাঁর কাছে এসেছেন সার্টিফিকেট নিতে । বরুণ বুঝতে পেরেছেন যুগ পালটেছে, পাঠক বদলেছে । প্রৌঢ় কবির কবিতা এখন আর ছাপা হয়না । কারণ একালের পাঠক চায় ধারালো কলম, ভাঙচোরা দুরাচারী ইমেজ ছাড়া পাঠক সন্তুষ্ট নয় । বরুণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কবি চলে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নতুন কবিতার বই হাতে নিয়ে এক তরুণ কবি বর্ষাতি জড়িয়ে বরুণের ঘরে এসে উঠলেন । কিন্তু বরুণ তখনও ক্লান্ত অবসন্ন প্রৌঢ় কবির বিদায়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মধ্যে মনে মনে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পেয়ে দুঃখ বেদনার গভীরে তলিয়ে যান ।	ভাবপ্রধান
ক্যারিকেচার	কলেজে পড়ার সময় থেকে ক্যারিকেচার করার আশ্চর্য প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও আই-এ ফেল করা অবনী কলেজ ছেড়ে দিয়ে সিনেমা থিয়েটারে কোথাও অভিনয়ের সুযোগ পায়নি । শিশিরকুমার, নির্মলেন্দু, অহীন্দ্রবাবু, দুর্গাদাস কিংবা নবদ্বীপ হালদারকে নকল করতে পারলেও নিজের কোনো এক্সিস্টেন্স তার ভেতরে সিনেমা কিংবা থিয়েটারের লোকেরা খুঁজে পায়নি । তাই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্যর্থ অবনী বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে কষ্টে দিন কাটিয়ে গল্পের বরুণের কাছে দশ টাকা ধার চাইতে আসে । ক্লার্ক কিংবা বেয়ারার চাকরী পেয়ে সে বাঁচতে চায় । বরুণ তার বাড়ি গিয়ে অবনীর বীভৎস দারিদ্র্যকে দেখে আসেন । অবশেষে একদিন খবর আসে, অবনী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে । বরুণ	চরিত্রপ্রধান ।

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	রোমান্টিক ?
	ছুটে গিয়ে দেখলেন -দাড়ি কেটে নামানো তরুণীর ফোলা মুখ , ঠিকরানো চোখ, ঝুলে পড়া জিভ , রক্তের ধারা - এ সবই যেন অদ্ভুতভাবে ভেংচি কাটছে তার ক্যারিকেচারের জীবনটাকেই ।	
মিছিলের মধ্যে	কারখানায় লকআউট, সন্তোষ বাড়ির জানলার ধারে বসে থেকে গ্রাম থেকে আসা কৃষকদের মিছিল দেখে মনে করে কবে যেন সে গ্রামে গিয়েছিল । সেখানে পাতা ঝরার শব্দে , আমাটেরতের কচি নিমের মঞ্জুরীতে, লাল লাল বাদামের পাতায় , খেজুরের রসঝরার গন্ধে , মৌমাছির ভীড়ে এক মুঠো রক্তের মতো ফুটে থাকা শিমুল ফুলে , জলার দিকে সবুজ জলের দুপাশের ভেতরে গ্রামের পথে তার সাথে দেখা হয় একটি মেয়ের , কথাও হয় অনেক । বন্ধুরা তার কাছে এই অবিশ্বাস্য কথা শুনে তার মানসিক বিকৃতির জন্যে ডাক্তার দেখাতে বলেছে । কিন্তু সন্তোষ সেই মিছিলের মধ্যে মিশে গিয়ে সেই মেয়েটিকে যেন খুঁজে বেড়িয়েছে। কারণ তাকে পেলেই সেই গ্রামের নাম , মনোমুগ্ধকর ছবি তার চোখে ভেসে উঠবে । কিন্তু সন্তোষ চিরকাল মিছিলের পেছনে থেকেছে , ভেতরে পথ খোঁজেনি ।তাই যাকে পেলে তার সব পাওয়া হয়ে যায় , সব জানা ফুরিয়ে যায় , তার কাছে সে কোনোদিন পৌঁছুতে পারে নি ।তবু সন্তোষ কোন এক অচেনা শহরের ঢেউ-বিহীন পথ ধরে অসংখ্য পায়ের শব্দের সাথে চলতে থাকে ।	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
সুন্দর	রত্নপুর কোলিয়ারী হাসপাতালের নতুন ডাক্তার সুবীর গুপ্তের সাথে নার্স দীপার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। ডাক্তার রোগীদের সুচিকিৎসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কুলি বিনটুকে তিনি কলিয়ারীর ধাঁদের ধুলি থেকে বাঁচিয়ে আনেন। ডাক্তারের এই সেবাব্রত ও দীপার সাথে নিবিড় মেলামেশা দেখে ম্যানেজার হেমেন সরকার একদিন ডেকে অপমান করেন। অপমানিত দীপা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। ডাক্তার তাকে স্টেশন থেকে ফিরিয়ে এনে বিয়ে করে সমস্যার সমাধান করলেন। তারপর একদিন গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোডে মোটর দুর্ঘটনায় আহত চিত্রতারকা মালিনী দেবী ও প্রোডিউসারকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। এদিকে দীপাকে প্রোডিউসার ও ডিরেক্টার স্টার হিসেবে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দীপা সুবীরকে ছেড়ে যেতে পারেনি। কিছুদিন পরে হাসপাতালে ডাক্তারের নামে এল বিরাট এক এক্সরে মেশিন। অডিটারের কাছে তহবিল তছরুপের দায়ে পড়লেন ডাক্তার। বিচারে তাঁর তিন বছর জেল হল। খবরের কাগজে ব্যাপারটা জেনে মালিনী দেবী নিজেই ছুটে এসে জানালেন - এক্সরে মেশিন তাঁরই দেওয়া। কুলিরাও নির্দোষ ডাক্তারের মুক্তির দাবীতে চীৎকার করেন। হেমেন্দু পড়লেন বিপদে। অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ডাক্তারকে তিনি মুক্ত করলেন। ল্যাবরেটরী করে দিলেন ডাক্তারের জন্য। কিন্তু ডাক্তার তখন অপ্রকৃতিস্থ। দীপার সাধনায় তাঁর চেতনা আবার ফিরে আসে।	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্‌শ্রেণীর
ছোরা	সুপ্রিয় সেন অফিসের কাজে রাণাঘাট গিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রেনে তার ফাইল কেসটা কে যেন বদলি করে নেয়। পরিবর্তে আরেকটা ফাইল কেসে সে রেখে দেয় একটি ছোরা। বাড়ি ফিরে সুপ্রিয় সেন ফাইল খুলে সেটি দেখে অবাক। কি করে ছোরাটি তিনি সরিয়ে দেবেন সে কথা ভেবেই চিন্তিত হলেন। বন্ধু নিখিলকে একথা বলেও তিনি স্বস্তি পেলেন না। স্ত্রী সুরমাকে সুপ্রিয় একথা জানতে দেননি। কিন্তু অফিসে যাওয়ার সময়ে বাড়িতে লুকিয়ে রেখে যান সেই ছোরা। সুরমা টেবিলের নীচের টানা থেকে সেটি বের করে নেয়। বাড়ি ফিরেই সুরমার মুখে এ খবর শুনে সুপ্রিয় বলেছেন, আত্মরক্ষার জন্য সেটি কেনা হয়েছে। কিন্তু সুপ্রিয়র মনে হল সুরমা হয়তো তাঁর অতীতের প্রেমিকা কেতকী মল্লিকের কথা ভেবেই দুপুরে তাঁর টেবিলের দেরাজ খোঁজেন। তাঁর মনে হয়, আট বছরেও নিখুঁত পারিবারিক জীবনের পরিচয়ে তিনি প্রমাণ করতে পারেন নি। সুরমা তাঁকে সন্দেহ করে। তিনি মনে করেন, ছোরাটি যেন তাঁরই বুকে বিঁধে আছে এবং থাকবে।	ভাবপ্রধান
দূত	পুলিশ কোর্টের উকিল বিরাজবাবুর মেয়ে সাবিত্রীকে প্রশান্ত পড়াত। সাবিত্রী আর প্রশান্তর মধ্যে ভালোবাসাও সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বিরাজবাবু সাবিত্রীর দেহের বিনিময়ে নিজের অপরাধকে ফিরিয়েছেন। মেয়ে সেই অধঃপতনের লজ্জা থেকে পরিত্রাণের জন্য গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।	চরিত্রপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	লোকশ্রুতির ?
ফিউজ	বাড়ির সবাই গেলে সুখময় নীলিমাদের বাড়ি এসে তাকে কাছে পেলেও এই বেশী পাওয়াটাকে কিছুতেই যেন নিজের করে নিতে পারে নি। নীলিমা চেষ্টা করেছিল ধরা দিতে। সে সুখময়ের হাত নিজের বুকেয় এনে চাপ দিয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে ইলেকট্রিকের লাইন ফিউজ হয়ে চারিদিকে অন্ধকার নামে। নীলিমা আলো জ্বালাতে সুখময়ের কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নেয়, কিন্তু কোথাও মোমবাতি খুঁজে পেল না। এদিকে অন্ধকারে বসে থেকে সুখময় নিজেকে চোরের মতো মনে করল। মনে হল, অন্ধকারে ড্রয়ারে হাত দিয়ে টাকা অথবা নীলিমার বাবার দামী ফাউন্টেন পেন চুরি করে নেয়! কিন্তু সুখময় পারে নি। অন্ধকারে নীলিমা ফিরে আসে, আর সুখময় হঠাৎ দরজা খুলে ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসে। কারণ নীলিমাকে সে ভালোবাসতে পারে, কিন্তু অন্ধকারে চুরি ডাকাতি করতে পারে না। অন্ধকারের সুযোগে নীলিমাকে চোরের মতো সে নিতে পারে না। তাই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ধরে সে ভবানীপুরের দিকে ছুটে চলে।	অবপ্রধান
অকলঙ্ক	উৎপল মজুমদার উৎপলাকে ভালোবাসত। কিন্তু উৎপলা সেই ভালোবাসার মূল্য না দিয়ে বিয়ে করে অন্য একজনকে। বড় বেশী ভালো ছেলে বলেই উৎপলাকে সে কিছু বলতে পারে নি। পরবর্তীতে প্রাইভেট লিমিটেড অফিসের কর্তা এই উৎপল তারই অফিসের টাইপিস্ট রুমু ব্যানার্জীকে মনে মনে ভালোবেসে নেয়। কিন্তু স্পেশ্যাল ইনস্পেকটর লিস্ট তার	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
	নাম নেই দেখে সব সুপ্ত উৎপলের কাছে স্পষ্ট হয়ে আসে। কুমুর প্রতি দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সৎ ও একনিষ্ঠ কর্মী উৎপল ইনক্রিমেন্ট না পেয়ে মনে মনে অভিযুক্ত করে কুমুকেই, সন্দেহ করে তার পূর্বের প্রেমিকা উৎপলাকেও।	ভাবপ্রধান
সিদ্ধিলাভ	রেডিয়োতে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মধ্যে চ্যারেটি ম্যাচ শুনতে এসে বুড়ো বাপ আর তাঁর মেয়ে তরলাকে ক্লাসিক্যাল গানের পরম ভক্ত জেনে অমলেশ জানায় সেও ক্লাসিক্যাল গানের চর্চা করে। ফলে তরলা অমলেশের দিকে আকৃষ্ট হয়। আসলে অমলেশ ক্লাসিক্যাল গান জানে না। তবুও ক্লাসিক্যাল গান গাইবে বলে সে কথা দেয় তরলাকে। মাস দেড়েক পরে পাড়ার নববর্ষ উৎসবে সে গান গাইবে। কিন্তু বন্ধু সুকুমারের সাথে বাদুরবাগানের ওস্তাদ বলরাম বাগচীর কাছে গান শিখতে গিয়ে অমলেশ তাড়া খেয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত অমলেশ সুখময় বিশ্বাসকে দিয়ে একশো টাকার বিনিময়ে পেছন থেকে গান গাওয়ায় এবং স্টেজে নিজে গলা নাড়ায়। গানের শেষে মুগ্ধ তরলা অমলেশকে ফুলের তোড়া দিতে এসে সুখময়ের কাছ থেকে আসল কথা শুনে নিয়ে সুখময়কেই তোড়া দিয়ে যায়। কিছুদিন পর সুখময় যখন বুঝতে পারে তরলা ও তার বাবা দুজনেই ক্লাসিক্যাল গানের মিথ্যে সমঝদার সেজে তার গান শুনেছে তখন সুখময় ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের বাজে কথা শুনিয়ে দেয়। অপমানিতা তরলা আবার ফিরে	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোনশ্রেণীর ?
	আজো অমলেশের কাছে । কারণ ক্লাসিক গান না জানলেও এখন আর অমলেশের কোনো অপরাধ নেই । গান না জেনেও সে তরনাকে পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করেছে ।	
নল্টির পা	ক্ষেতমজুরের ছেলে বলাই চাষের কাজ ছেড়ে কোলি-য়ারীর কয়লাকাটার কাজ নিয়েছিল । সেখানেই বলাই বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি ফিরছিল । পথে পথে মাঠ, সোনালী রোদ , নীলকণ্ঠ পাখি আর ধানের দৃশ্য দেখে নতুন বউ বলাইকে কোলিয়ারীর কাজ ছেড়ে চাষের কাজে ফিরে আসতে বলে । বলাইও স্বপ্ন দেখে সুখী জীবনের। ধানী জমি , বাবার অসুস্থতা , মায়ের দুঃখমোচন করে নতুন বউ নবান্নে নল্টিকে নিয়ে আসবে তার ঘরে ।	ভাবপ্রধান
মদনভস্ম	বহু কষ্টে সময় সংগ্রহ করে এক সন্ধ্যায় জলের ধারে গাছের ফাঁকে লুকানো চাঁদ আর ফুলের গন্ধের ভেতর প্রেমিক প্রেমিকা এসে বসেছে । তারা এসেছিল নতুন কথা , নতুন তারা , কবিতার লাইন ; গানের সুর খুঁজতে । কিন্তু তারা কিছুই পেলোনা । বাবাকে একটি বাজে কথা বলার জন্যে ছেলেটির মন খারাপ , কোচিং ক্লাস ফাঁকি দেবার জন্য আপশোষ , বি.টি. পড়ার আশা , এম.এড্ পড়ার স্বপ্ন আর মেয়েটির শর্টহ্যান্ড ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এসে অস্বস্তি , ছোটো ভাইয়ের জ্বরের জন্যে চিন্তা — এসবের মধ্য দিয়ে বহু যত্নে সংগ্রহ করা মূল্যবান সময়ে দুজনের আসল কথাটি বলাই হলনা । ঠিক ঐ সময় তিনটে বেকার যুবক এসে তাদের দুজনের কাছ থেকে মিষ্টি	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কেন গ্রহণীয় ?
	কথা বলে যাচ্ছি, মানিব্যাগ নিয়ে চলে যায়। এই ঘটনায় ফেরার পথে ট্রামে বসে মেয়েটি ভাবে - এই নির্জন পুকুরে এমনি করে আসাটাই যেন স্বাভাবিক। কারণ নিরালা সন্ধ্যার জন্যে আয়োজনের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ সেই আয়োজন দিন রাত্রির সব উজাড় দু'জনের মাঝখানের পথ যাত জায়গাটাও দখল করে নেয়। কাছাকাছি বসেও তখন আসল কথাটা আর বলা হয় না।	ভাবপ্রধান
কমিশন	'মায়াবী রাত' ও 'ভোরের শিশিরের' লেখক অমৃত মজুমদার অধিক কমিশনে বই বেচেন, কিন্তু নিজের পুরনো বইগুলো গল্পের চাহিদা তিনি দিতে পারেন না, কারণ তাতে কমিশন কম।	চরিত্রপ্রধান
পাহাড়ের সারি	পর্ণার ধরে বেড়াতে এসে পাহাড়ের সারির কাছে বসে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ব্রিজের তলায় আশ্রয় নিয়ে গল্পের বক্তা একদল উদ্বাস্তু মানুষের অভিশপ্ত অসহায় দৃশ্য দেখেন।	ভাবপ্রধান
যাচাই	সাহায্যের প্রয়োজনে সত্যতা যাচাই করবার জন্যে কলকাতার এক কলেজের অধ্যাপক সাহায্যপ্রার্থী একটি পনের বছরের ছেলের সঙ্গে এসেছেন বস্তিতে। সেখানে তার পরিবারের অসহায় করুণ দৃশ্য দেখে তিনি শিউরে ওঠেন। ছেলেটির বাবা দারিদ্র আর অসুখের জ্বালায় গলায় ফাঁসি দিয়ে মরেছে। ভাইবোন দিন অনাহারে। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে তাকে বাঁচাতে অধ্যাপক চেষ্টা করে তারই কলেজে ছেলেটির চাকরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।	ঘটনাপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
মোহিনের বাবা	মোহিনের জন্য মেয়ে দেখতে এসে তার পঁয়তাল্লিশ বছরের বিপত্নীক বাবা নিজেই মেয়ে পছন্দ করে বসেন। অচেনা, অজানা হলেও কথায়কথায় মোহিনের বাবা গল্পের কথকে মোহিনের নয়েকটুকিং করেন। শেষ পর্যন্ত স্টেশনে ট্রেন এসে গেলে চাপাচাপি ভীড়ে গাড়ির ফুট বোর্ডে দাঁড়িয়ে থেকে মোহিনের বাবা পড়ে যান। তাঁর পেছনের কামরা থেকে মোহিন ছুটে এসে পাগলের মতো চীৎকার করতে থাকে তার বাবার জন্য।	চরিত্রপ্রধান
আরো একজন	সামান্য চাকুরে মনোরঞ্জন অফিসের কাজ, বাজার, রেশন এসবের মধ্যে জড়িয়ে থেকে রুটি ভাতে যোগানো মধ্যাহ্নের ভোজন করতে গিয়ে পরপর চারটি সন্তানের জননী নতিকার গর্ভে যখন আরেকজনের আগমনের আভাস নতিকারই কণ্ঠ থেকে শুনতে পেল তখন মনোরঞ্জনের গলায় খাবার আটকে যাবার উপক্রম হল। অফিসের বন্ধু মৌলিক অবিবাহিত হলেও এ ব্যাপারে ওঁকে পরামর্শ দেয় গাইনোর কাছে যেতে। কিন্তু গাইনোর চেম্বারে অন্যান্য মেয়েদের পাতুকুর সম্ভাবনার দৃশ্য দেখে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব মনোরঞ্জন গর্ভপাতের জন্য রাজী হলেও তার স্ত্রী নতিকা সাহস পেল না। সেজন্যে দুজনেই গাইনোর চেম্বার থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসে। মৌলিক খবরটা জেনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু মনোরঞ্জন ভাবে, নতিকার ছেলে মেয়েরা বড় সুন্দর হয় - হয়তো এবারে কোনো অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে কিংবা কোনো প্রতিভাধর দিকপাল ছেলে আসবে নতিকার গর্ভে - সে হয়তো তাদের দুঃখ	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্‌ শ্রেণীর ?
	গ্লানি দূর করবে । অভাবপীড়িত সংসারেও এই চি-তায় মনোরঞ্জনের মনে হল তার সামনের জানলা দিয়ে যেন বসন্তের বাতাস আসছে ।	
মাধ্যাকর্ষণ	অনেকবেশে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে নোটিশ দেওয়ার পরেও মল্লিকার সাহস হলোয়নি মা-বাবাকে দুঃখ দিয়ে অনিন্দকে বিয়ে করতে । আই.এ. ফেল অনিন্দ গরীবের ছেলে । ব্যবসায় নিজের চেষ্টায় খানিকটা উঠলেও সুন্দরী ও বনেদী পরিবারের মেয়ে মল্লিকার কৌলীন্যের সঙ্গে তুলনায় নিজেকে ছোট মনে করেই মল্লিকার বিয়েতে অনিন্দ নেকলেস দিয়ে উপহার দিয়ে আসে । তার পাঁচ বছর পর অনিন্দর সঙ্গে মল্লিকার দেখা হয় প্লেনে । অনিন্দ তখন রীতিমতো ব্যবসাদার । প্লেনেও সে ব্যবসার কাগজপত্রে ডুবে ছিল। এমন সময় মল্লিকা এসে তার পাশে দাঁড়ায়, কথা বলে ও পাশে বসে । মল্লিকা অতীতের ভুলের মার্জনা চেয়ে নূতন করে অনিন্দর সঙ্গে আবার ঘর বাঁধতে চায় । কিন্তু অনিন্দ ভাবে - স্বামী কন্যা ও সুখের সংসার ছেড়ে মল্লিকা এ কী করছে । তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় মল্লিকার কথা । অতীতকে মল্লিকা মুছে ফেলতে রাজী । অনিন্দ তাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই সে চলে যাবে। এ বিশ্বাস তার আছে, তার স্বামীর দুরন্ত প্রেসটিজ জ্ঞানের জন্যই তাকে সে ডিভোর্স করবে । কলকাতায় পৌঁছে তিন দিনের মধ্যে তাকে জানাতে বলেছে সে অনিন্দকে । কিন্তু পরক্ষণেই মাইক্রোফোনে এয়ার হোস্টেজের সুরেলা কণ্ঠ ইংরাজীতে ধ্বনিত হয় যাত্রা শেষের বার্তা । প্লেন এসে কলকাতা	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	বিমানবন্দরের মাটি ছুঁয়েছে। তার তৎক্ষণাৎ প্লেনের ভেতরের সমস্ত গ্লানি ভুলে মল্লিকা বিমানবন্দরে অপেক্ষমান স্বামী ও কন্যা খুঁজে দেখে আনন্দর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। আনন্দ বুঝল — কোনোদিনই তার মল্লিকার কাছে দরকার পড়বে না।	ভাবপ্রধান
আসানসোলের লোকটা	কানা — একচোখ কানা, এক পা ছোট সবদিক থেকে মার খাওয়া এক মানুষ। জীবনে সে অনেক জায়গায় ঘুরেছে, অনেক ঘাটের জল খেয়েছে। তার জন্ম হয়েছে রানীগঞ্জে, কিন্তু তার দেশ ছিল পাঞ্জাবে। কোন কাজই যখন তার ভাগ্যে জোটেনি তখন সে কাজ নিয়েছে একটি হোটেলে। কার্নাইল সিং হোটেলের মালিক। তাকে সে খুব পছন্দ করে কারণ তার হাতের তৈরী মাংস আর আলু মটর বানওয়ালা তার কোলিয়ারি এলাকায় সর্দারদের কাছে বেশ নাম করেছে। ধানবাদে থাকতে সে হাজারীবাগের একটি কালো মেয়েকে নিয়ে সংসার পেতেছিল। কিন্তু কানা ল্যাংড়া বলে তাকে ছেড়ে সে একদিন চলে গেছে তার মর্জি। তার দেশ পাঞ্জাবকে সে কোনোদিন দেখেনি। তার মুখে যেন শুনেছিল হীর রানঝার গল্প। রানঝাকে ভালোবেসে হীরকে হতে হয়েছিল মহিষের রাখাল। তবুও সেই কালো মেয়েটার কথা ভেবে তার বুকের ভেতরটা মাঝে মাঝে মোচড় দেয়। হোটেলের বাচ্চা ছেলেটির মুখের গান তার ভালো লাগে না, সে তাকে গালি দেয়। কিন্তু একদিন পরিবেশনের সময় বাচ্চা ছেলেটি অসতর্ক ভাবে মদের গ্লাস উল্টে ফেলে দিলে কোলিয়ারির গুণ্ডাদের মধ্যে	

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন্ শ্রেণীর ?
	একজন ছেলেটিকে নামিয়ে দেয়। এই ঘটনায় সহানুভূতি দেখানোর জন্য একজন গুণ্ডা ছেলেটির দিকে একটি আধুলি এগিয়ে দেয়। ছেলেটি তা নেয় না। গুণ্ডাটি সেটিকে ছুঁড়ে দেয় তার মুখের দিকে। আধুলিটি গিয়ে পড়ে নর্দমায়। গুণ্ডারা চলে গেলে কানা ছেলেটিকে বলে যে সে নিজেই তাকে একটি আধুলি দেবে। বাচ্চা ছেলেটিকে আধুলি দেবার কথা ভেবে তার মনে যেন খুশি লাগে। এরই মধ্য দিয়ে কানার জীবনের যেন কোথায় হাওয়া বদল হয়ে যায়।	চরিত্রপ্রধান
আলেয়ার রাত	বৃষ্টি ঝরা এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে গল্পের উত্তম পুরুষ তার সঙ্গীর (মারাণের) আহ্বানে প্রথমে রাজী না হলেও শেষ পর্যন্ত বাড়ির সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চুপিচুপি মাঠ-বন-জঙ্গল আর জলী নদী পেরিয়ে ওস্তাদ নাল খাঁ আর গহরা বাই এর গান শুনতে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই যাত্রাপথে বিপদ ঘনিয়ে আসে। পুল ভেঙে জলী নদীর জলস্রোতে পড়ে তারা দুজনেই ভেসে গিয়েছিল। তারপর আলেয়ার আলো, দুঃস্বপ্ন সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত ভয়াবহ পরিবেশের মধ্য দিয়ে উত্তম পুরুষ নিজের প্রাণ বাঁচালেন, কিন্তু তার সঙ্গীর মৃতদেহ জলী নদীর স্রোত বেয়ে না গিয়ে দূরে বটগাছের শিকড়ে আটকে থাকে। পুল ভেঙে পড়বার সময় ভাঙা কাঠের ধারালো অংশ বুকে বিঁধেছিল বলে মারাণ বাঁচতে পারে নি।	ভাবপ্রধান

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু	কোন শ্রেণীর ?
টুটুল	কলকাতা থেকে দুশো মাইল দূরে মিশনারি বোর্ডিং স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন মা। ছেলে ভবিষ্যতে উপযুক্ত মানুষে পরিণত হোক - এই ছিল মায়ের ইচ্ছে। প্রথমত কান্নাকাটি করত বলে মা পরপর চারদিন তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে যখন মা এলেন না তখন মায়ের কথা ভেবে টুটুলের বুক ফেটে কান্না আসতে চাইল। পরদিন সকালেও যখন মা এলেন না তখন টুটুলের কাছে সব ফাঁকা। মনে হল যেন তার কেউ নেই, কোথাও নেই। তাই বিকেলের রোদ পড়ে আসবার আগেই সকলের অগোচরে সে বেরিয়ে পড়ে মায়ের উদ্দেশ্যে। তারপর মাইলের পর মাইল হেঁটে টুটুল শেষ পর্যন্ত তার মায়ের কাছেই ফিরে আসে।	ঘটনাপ্রধান

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট অনুযায়ী ঘটনাপ্রধান গল্প' ঘটনার বৈচিত্র্যের উপরেই নির্ভর করে এবং ' বৃত্তান্তের' দিকে ঝুঁকে পড়বার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা তার মধ্যে থাকে। [৩৩] এদিক থেকে বিচার করলে ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোট গল্পগুলির মধ্যে ঘটনাপ্রধান গল্পের সংখ্যাই বেশী। তবে লেখক অত্যন্ত আঙ্গিক সচেতন ছিলেন বলে তাঁর গল্পগুলি বৃত্তান্তমুখী হয়ে ওঠেনি। ঘটনার ভার তাঁর গল্পের ইঙ্গিতমূলকতা গুণকে নষ্ট করতে পারেনি, বরং ছোটগল্পগুলিতে ব্যঞ্জনাধর্মিতার সৌন্দর্যই ফুটে উঠেছে। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্পের ঘটনাপ্রাধান্য আলোচনা করে এই ঘটনা প্রধান গল্পগুলির বিশিষ্টতা নিরূপণ করছি।

৩৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যে ছোটগল্প : ৫ম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৮৪, ডি.এম.লাইব্রেরী, কলিকাতা - ৬, পৃষ্ঠা - ৩১২

'অনোজন' গল্পটি তারাপদর ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী । শ্বশুর জানকী চক্রবর্তীর গৃহে উপার্জনহীন তারাপদর দৈনন্দিন জীবন যখন অপমানে অভিমানে ক্ষতবিক্ষত তখন একদিন স্ত্রী কন্যাকে ফেলে রেখে সে গৃহত্যাগী হয়েছে । দিল্লী, লাহোর, পাঞ্জাব প্রভৃতি শহরে সহায়সম্বলহীন হয়ে ঘুরে ঘুরে অর্ধাহারে বা অনাহারে দিন কাটিয়ে তারাপদ পাঞ্জাবের একটি পশমের দোকানে চাকরী পায় । পাঁচ বছর পরে একমাসের ছুটি নিয়ে সে ছুটে আসে বাংলা দেশে । আড়িয়াল খাঁর জলস্রোতের মধ্য দিয়ে নৌকো করে শীতল মাঝিই তাকে পৌঁছে দিয়েছিল মধুগাঁয়ের চক্রবর্তীদের ঘাটে । কিন্তু ততদিনে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষে শ্বশুরবাড়ির অবস্থা বড়ই শোচনীয় । শ্বশুর জানকী চক্রবর্তী কলেরায় মারা গেছেন । অনন্ত না নেই, কঙ্কালসার দেহে বেঁচে আছেন অনন্তদার স্ত্রী । পেটের ভাত আর পরনের কাপড় জোটাতে না পেরে তারাপদর স্ত্রী অরুণা খালের জলে ডুবে মরেছে, মেয়ে হয়েছে নিরুদ্দেশ । গল্পের প্রথমাংশে তারাপদর জীবনের চরম বিপর্যয়টিকে এই ভাবেই লেখক তুলে ধরেছেন । তাতে কৃত্রিমতা নেই, আছে তারাপদর মানসিক যন্ত্রণার আভাস, আছে শীতল মাঝির বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্পর্শ । গল্পটির দ্বিতীয়াংশে কুড়ি টাকা ভাড়ার লোভে শীতল মাঝি কর্তৃক চালের কারবারী মহাজন মথুরা দাসের বস্তা নৌকোয় তুলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার ঘটনা ও পথে টর্চের আলোয় ধরা পড়তে গিয়ে ভেদ-বমির রোগীর নৌকো পরিচয় দিয়ে শীতল কর্তৃক মথুরা দাসকে বাঁচিয়ে দেওয়ার ঘটনায় দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের একটি নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে । ঘটনার উপস্থিতি গল্পটিকে বৃত্তান্তপ্রবণ করে তোলেনি, ঘটনার আশ্রয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের মানুষের অসহায় জীবনচিত্রটি পরিষ্কার ধরা পড়েছে । দ্বিতীয়াংশটিতে চালের কারবারী মথুরা দাসের চালের বস্তা নৌকো করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় ও শীতল মাঝির আদর্শ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষের দিনে বাঁচবার প্রয়োজনে অর্থোপার্জনের চিত্রটিই উদ্ঘাটিত হয়েছে ।

'পুষ্করা' গল্পে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের দিনে দেখা দিয়েছে কলেরার মড়ক । ঘোষপাড়া গ্রাম এই মড়কে আক্রান্ত হয়ে শ্মশানে পরিণত । তাই গ্রামের সম্পন্ন মহাজন বলাই ঘোষ তিনশো টাকা কনট্র্যাক্টে শহর থেকে পণ্ডিত তর্করত্নকে আনিয়ে শ্মশান কালীর পুজোর আয়োজন করেছেন । শুক্লাচতুর্দশীর রাতে তর্করত্ন শ্মশান কালীর পুজোয় বসেছেন।

শ্মশান মাটির সাথে চিতার কয়লা মিশিয়ে কালী কুমোর দেবীর পৈশাচিক মূর্তি তৈরী করেছে, কেশব ঢুলী বাজিয়েছে ঢাক। তর্করত্ন অদূর অন্ধকারে কলাপাতায় করে লুচি আর মাংস সাজিয়ে শিবাভোগ গ্রহণ করতে দেবীকে কাতর প্রার্থনা জানান। রাত ভোর হয়ে আসে - তবু দেবী শিবাভোগ গ্রহণ করেন না। তর্করত্ন ভাবলেন আর রক্ষে নেই। শ্মশান কালীর কোপে পুষ্করার আক্রমণ থেকে গ্রামকে বুঝি আর বাঁচানো গেল না। কিন্তু তর্করত্নের বিশ্বাস আছে, তাঁর সারাজীবনের ঐকান্তিক দেবী আরাধনা বৃথা হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত দেবী এসে শিবাভোগ গ্রহণ করলেন। তর্করত্ন ভাবলেন - এতদিনে তাঁর সাধনা সার্থক। ভোর না হতেই গ্রামের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল — শ্মশান কালী নিজে এসে ভোগ নিয়েছেন। সুতরাং, গ্রাম রক্ষা পাবে, দেশরক্ষা পাবে, মারী মন্বন্তর সব ঘুচে যাবে। চারিদিকে তর্করত্নের প্রশস্তি। শহরে ফিরে যাবার জন্যে ট্রেন ধরবেন তর্করত্ন। গোরুর গাড়িতে করে তিনি চলেছেন স্টেশনের দিকে। দান আর দক্ষিণায় তাঁর গাড়ির অর্ধেক বোঝাই। আনন্দ বলাই ঘোষ তাঁর হাতে তুলে দেন পাঁচশো টাকা। আর তর্করত্ন রেখে যান তাঁর প্রতি দুহাত ভরা আশীর্বাদ। কিন্তু রাস্তার উপরে সেদিন মরে পড়েছিল ডোমপাড়ার পাগলিটা। আসলে শ্মশান কালী নয়, শিবাভোগ গ্রহণ করতে এসেছিল এই পাগলিটিই। দীর্ঘ দিনের বুভুক্ষার পর এই আহার গ্রহণ করে সে সইতে পারেনি। গল্পের প্রথম থেকে প্রায় সমাপ্তি অবধি মড়ক বিধ্বস্ত ঘোষপুর গ্রামে তর্করত্ন কর্তৃক শ্মশান কালীর পুজো, শিবাভোগ প্রদান, তর্করত্নের বিদায় - এইসব ঘটনার মধ্যদিয়ে যে অলৌকিক বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল, ডোমপাড়ার পাগলিটার শিবাভোগ গ্রহণের ঘটনায় সেই বিশ্বাসের বেদীমূলে তীব্র আঘাত করা হয়েছে। দুস্থ - দুর্ভিক্ষ - পুষ্করার দিনে গ্রামের অবস্থাপন্ন মহাজন ধান চালের কারবার করে মুঠোমুঠো টাকা কুড়িয়েছিলেন। লোক দেখানো প্রীতির জন্যই তিনি তর্করত্নকে দিয়ে শ্মশান কালীর পুজোর আয়োজন করেছিলেন, গ্রামকে পুষ্করার প্রকোপ থেকে মুক্ত করবার জন্যে নয়। 'পুষ্করা' গল্পে এই সামাজিক সত্যটিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং এই মূলেই গল্পটি ব্যঞ্জনাধর্মী। সুতরাং ঘটনা প্রাধান্য গল্পটির প্রাণসম্পদকে এতটুকু বিনষ্ট করে নি।

'সৈনিক' গল্পটি ঘটনা প্রধান। কুমার দমগ্রামের দেবীকোট রাজবংশের উত্তর পুরুষ জমিদার চন্দ্র চৌধুরীর মতো মহান শক্তিশালী জমিদারের আমলে

সাঁওতালরা পালগ্রামের টিলায় বসবাস করার অনুমতি পেয়েছিল । চন্দ্র চৌধুরীর সাথে জড়িয়েছিল হাতী নীল বাহাদুরের নাম । চন্দ্র চৌধুরীর স্নেহ, বর্ষার জল, অথচ কাঞ্চনের কূল ছাপানো ঢলে মাঠে মাঠে সোনা ফলিয়ে সাঁওতালরা যখন উপনিবেশ স্থাপন করেছে তখন নীল বাহাদুরকে নিয়ে নায়েব আর জমিদার এলেন পালগাঁয়ে । জমিদার তাদের খাজনা মকুব করলেন । পালগাঁয়ের টিলায় বাঘ আর ডাকাতের ভয় দূর করে সাঁওতালরাই হয়েছিল তাঁর জমী পত্তন । কিন্তু কিছুদিন পর পাগলা ঘোড়া থেকে পড়ে চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যু হল । তাঁর পুত্র ইন্দু চৌধুরী হলেন জমিদার । হাতী নীল বাহাদুর নয়, ইতিহাসের এম.এ. ইন্দু চৌধুরীর বাহন হল বেবি অস্টিন । পীলখানায় নীলবাহাদুর পড়ল বাঁধা । কিন্তু নায়েব নৃসিংহ মুখুজ্জেকে নিয়ে পালগাঁয়ের পাহাড়ে বেড়াতে এসে ভাঙা ইট আর পাথরের টুকরো দেখে তাঁর ঐতিহাসিকের চোখ লোলুপ হয়ে ওঠে । পালগাঁয়ের টিলার মাটি খুঁড়ে তিনি বের করে আনবেন ঐতিহাসিক নিদর্শন । ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য, পাল রাজাদের মূল্যবান তাম্রশাসন ও দিগ্বিজয়ের ইতিহাস হয়তো তাতে আবিষ্কৃত হবে । নায়েব, নৃসিংহ মুখুজ্জে তাতে চিন্তান্বিত হলেও ইন্দু চৌধুরীর শিরায় দেবী কোট রাজবংশের রক্ত ফেনিয়ে ওঠে । কিন্তু শুধু ইতিহাসের মূল্যবান সত্যসন্ধানই নয়, নিজের শক্তিকেও তিনি যাচাই করে নিতে চান । নীল বাহাদুরকে তিনদিন অভুক্ত রেখে তিনি নায়েবকে বললেন - নীলবাহাদুরকে লেলিয়ে দিয়ে সাঁওতালদের ধান দলে পিষে ফেলতে । হলও তাই । কিন্তু সাঁওতালেরা পাল্টা জবাব দিল । চন্দ্র চৌধুরীর আমলে তারা যে নীলবাহাদুরকে ভালোবাসত, সেই নীল বাহাদুরকে তারা তীরের আঘাতে বিদ্ধ করল । ইন্দু চৌধুরীর বন্দুক থেকে দেবীকোট রাজবংশের শেষ প্রতাপ হিসেবে বেরিয়ে এল গুলি । আর শরবিদ্ধ নীল বাহাদুরের চাপে ইন্দু চৌধুরীর বেবি অস্টিন গেল গুঁড়ো হয়ে । ঘটনা প্রধান হিসাবে এ গল্পের আবেদন তাই কোন অংশে কম নয় ।

ঘটনা নির্ভর গল্প যে কি ভাবে শিল্প সার্থকতা প্রাপ্ত হতে পারে তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 'ভোগবতী' গল্প । প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যেঘেরা ভৈরব পাহাড়ে কাঠ কেটে সহজ সরল জীবনের ছন্দে সাঁওতাল মুকলাল আর সোনার দিন কেটে যেত । কিন্তু ভৈরব পাহাড়ের নীলকণ্ঠ পাখির ডাক, ভোগবতী ধারার মতো পাহাড়ী ঝর্ণার

মিষ্টি সুর আর সোনার কণ্ঠের গান ছাপিয়ে আকাশে যেদিন দেখা দিল হাওয়াই জাহাজ, সেইদিন থেকে ওদের জীবনে নেমে এল ধ্বংসত্বের আবির্ভাব। একমাসের মধ্যে সব পালটে গেল, বদলে গেল পৃথিবীর রূপ। বদলে গেল সোনা আর শুক্লাল। বুড়ো টাট্টু ঘোড়ায় চেপে হরিকৃষ্ণ রায় মিষ্টি কথা আর টাকা ছড়িয়ে সাঁওতালদের লুব্ধ করে তোলেন। চাষী সাঁওতাল, খেড়ে সাঁওতাল সবাই লাঙল ধনুক ছেড়ে হাতে তুলে নেয় শাবল। মরচে ধরে কাঠুরেদের কুড়ুলে। যুদ্ধের প্রয়োজনে সমগ্র এলাকা জুড়ে ডিফেন্সলাইন তৈরীর কাজে শালপলাশের ছায়াকুঞ্জের ভেতরে রাঙা কাঁকরের টানা পথ ক্ষত বিক্ষত করে আসে জীপ, লরী, ট্রাক, বিচিত্র যন্ত্রপাতি আর মানুষ। বসে কলোনী, এরো ড্রাম। ঘর্মাক্ত অমানুষিক শক্তিতে সুখলালেরা কাটে মাটি, আর সোনারা ঝুড়ি ভরে সেই মাটি ফেলে পাথরের উপর। সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় ভৈরব পাহাড়ের কালো রুদ্ররূপ দেখে শুক্লাল ও সোনা সঙ্কল্প করে ভৈরব পাহাড়ে গিয়ে কাঠ কাটবে। কিন্তু মজুরী আর মদের নেশায় শুক্লাল পরদিন সকালে আবার ফিরে আসে রাস্তার কাজে। তারপর একদিন এক মাতাল ড্রাইভারের বেসামাল গাড়ি উল্টে গেলে তার নীচে পড়ে সোনা পিষ্ট হয়ে যায়। সোনার মৃত্যুতে শোকাহত শুক্লাল মনে করে ভৈরব পাহাড় তার উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। এই ঘটনায় বহুদিনের মরচে পড়া কুড়ুলে আবার শান দিয়ে ভৈরব পাহাড়ের দেবতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে শুক্লাল পাগলের মতো ভৈরব পাহাড়ে গিয়ে গাছ কাটতে থাকে। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সে ভোগবতী ধারার জলপান করার জন্যে কালো অজগরের মতো লোহার নলকে কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে ; কারণ সেই নলই ঝোরার জল শুষে নিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের মাথা থেকে সেন্ট্রির রাইফেলের গুলি ছুটে আসে। সেই গুলিতেই মুখ থুবড়ে মরে পড়ে থাকে শুক্লাল। বৃত্তান্ত রচনার কোন প্রয়াস এ গল্পে নেই। প্রকৃতির মাঝে মানবজীবনের নিবিড়তম যোগসূত্রটিই গল্পের একান্ত আকর্ষণ। যেখানে এই সম্পর্ক ছিন্ন করে জীবনে এসেছে কৃত্রিমতা সেখানেই জীবনযন্ত্রণা তীব্রতর হয়েছে। আশ্চর্য ব্যঞ্জনধর্মিতার মধ্য দিয়ে

এইভাবে 'ভোগবতী' গল্পের ঘটনা প্রাধান্য গল্পটিকে সার্থক ছোটগল্পের মর্যাদা দিয়েছে ।

'বনজ্যোৎস্না' গল্পে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী মহীতোষ আর অরবিন্দ পালিয়ে এসেছিল ডুয়ার্সের জনঢাকা তীরের অরণ্যে । কিন্তু ঘন শালবনের আড়ালে মহীতোষ অরবিন্দকে হারিয়ে খিদে তেষ্টায় কাতর হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে থাকে । ভুটানী মেয়ে পিউকুমারী এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আশ্রয় দেয় তার বাবা কুন্দবীরের ঝোপড়ীতে । ১৯১৪ সালের লড়াই ফেরৎ কুন্দবীর ভুটান সরকারের দাক্ষিণ্য পেলেও পরবর্তীতে ডুয়ার্সের জনঢাকা পারের জঙ্গলেই চলে আসে । ইংরেজের রাজত্বে কুন্দবীর সাহস না পেলেও পিউকুমারীর কথায় শেষ পর্যন্ত মহীতোষকে আশ্রয় দেয় । কুন্দবীরের পচাইয়ের দোকানে আড্ডা বসে কুলী আর পাহাড়ীদের । মহীতোষ নিজেকে আড়ালে রেখে দিন কাটায় ছদ্মবেশে । কিন্তু পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে কুন্দবীরের পচাইয়ের দোকানে কাঠের কারবারী বলদেওর আগমনে । কুটবুদ্ধি বলদেও পিউকুমারীকে টাকার লোভ দেখিয়ে আয়ত্ত করতে চায় । পিউকুমারী রাজী হয়নি, প্রচণ্ড চড় মেরে যোগ্য জবাব দিয়েছিল বলদেওকে । সেই অপমানে ফেরারী আসামীকে আশ্রয়দেবার অপরাধ ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে পিউকুমারীকে সে বলে, তার সাথে রাত কাটাতে । বিপন্ন পিউকুমারী মহীতোষকে এসে জানায় সব কথা । স্থির করে উভয়ে মিলে পালিয়ে যাবে সিকিমে । শুরু করবে নতুন জীবন । কিন্তু টাকা দরকার, তিনশো । অগত্যা পিউকুমারী শেষ পর্যন্ত একটি রাতের শুচিতার বিনিময়ে টাকা সংগ্রহ করতে বলদেওর সঙ্গে রাত কাটায় । কিন্তু টাকা সংগ্রহ করে এসে দেখে মহীতোষ নেই । পাহাড়ী মেয়ের সাথে প্রেম করে দিন কাটানোর হাত থেকে উদ্ধার করে অরবিন্দ তাকে আরো পঁচিশ মাইল দূরের আরেক আশ্রয়ে নিয়ে চলে গেছে । পিউকুমারী মহীতোষকে পেলনা, কিন্তু বলদেওর দাবাগ্নির শিকার হল । ঘটনাপ্রধান গল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হয়েও এ গল্পের রোমান্টিক আবেদন মর্মস্পর্শী ।

'ইজ্জৎ' গল্পে আছে দেশব্যাপী বস্ত্র সংকটের ঘটনা আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। গল্পটি ঘটনাপ্রধান। একই গ্রামে ফকিরের সমাধি ও তালতলে কালীর থান পাশাপাশি। কিন্তু মুসলমানদের মাদ্রাসায় এক মৌলবী এসে বক্তৃতা দিয়ে আবহাওয়া দিলেন পালটে। মুসলমান পাড়ার ধলা মণ্ডাই এসে নমঃশূদ্র পাড়ার জগন্নাথ ঠাকুরকে শাসিয়ে বলে তালতলে কালীর থানে পুজো নিষিদ্ধ। আত্মমর্যাদায় ঘা লাগায় নমঃশূদ্রের বামুন জগন্নাথ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পুজো তারা করবেই। কাজেই নমঃশূদ্র পাড়া থেকে ধ্বনি ওঠে কালী মাইকি জয়, মুসলমান পাড়া থেকে তার জবাব পাঠিয়ে বলে — আল্লাহু আকবর। আসন্ন ঝড়ের সংকেতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গ্রাম। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত অনিবার্যই হোকনা কেন গল্পের আসল ঘটনা অন্য পথ ধরে এগিয়েছে। দুর্বহ বস্ত্র সংকটে কাপড়ের অভাবে ধলা মণ্ডাইর ঘরের জরু বিবির ইজ্জৎ রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে, জগন্নাথের বউ ও ঘর থেকে বেরোতে পারে না বলে আত্মহত্যা করতে চায়। তাই মুসলমান পাড়ার মাথা, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার ও ফুডকমিটির সভাপতি হাবিব মিঞার কাছে কাপড় চাইতে এসেছিল মণ্ডাই, কিন্তু হাবিব মিঞা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। জগন্নাথও হাবিব মিঞার কাছেই আসছিল। পথে মণ্ডাইর কাছ থেকে শুনতে পায় - হাবিব মিঞা কাপড় দেয়নি। ফলে ধলা মণ্ডাই ও জগন্নাথ দুজনেই মনে মনে হাবিব মিঞাকে খুন করবার জন্যে সংকল্প করে। সকাল বেলায় মণ্ডাই দলবল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল হাবিব মিঞার বাড়ির দিকে, কিন্তু কান্নার শব্দে পা জড়িয়ে আসে সকলের। হাবিব মিঞার লাল বিবি মরেছে। মুসলমান পাড়ায় নেমেছে শোকের ছায়া। হাবিব মিঞা চমৎকার রঙীন শাড়ি আর ধবধবে চাদরের কাফনে লালবিবিকে কবর দিয়েছেন। সেই লোভ সামলাতে না পেরে ধলা মণ্ডাই ও জগন্নাথ দুজনেই রাতের অন্ধকারে কবর খুঁড়ে লালবিবির কাফনের কাপড় চুরি করতে থাকে। এই ঘটনায় হাবিব মিঞা সমবেত মানুষকে বললেন — দুজনকেই মারতে। কিন্তু কেউই এগিয়ে আসেনি। ফকির আর তালতলে কালীর থান নিয়ে বিরোধ এই ভাবেই মিটমাট হয়ে যায়। ঘটনাপ্রধান গল্প হলেও বস্ত্র সংকটের ভয়াবহতা যে মানুষের মধ্যে কৃত্রিম সাম্প্রদায়িক বিভেদ মুছে দিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে সকলকে একই সমতলে নামিয়ে আনে — এগল্প তারই প্রমাণ।

'শিল্পী' গল্পে শিল্পী সনাতনের দুঃখময় জীবনের কাহিনী আশ্চর্য কোমলতার আভাসে বর্ণিত হয়েছে। শিল্পীর দেশ উড়িষ্যাকে পুরী আর ভুবনেশ্বর দেখে চেনা যায় না। চেনা যায় ধরা মহানদী, লোনা নদী চন্দ্রভাগার তীরে তীরে ঝাড় আর কেয়াকুঞ্জে ঘেরা ছোট ছোট গ্রামের শিল্পীদের প্রতিভার পরিচয়ে। কেয়া, পদ্মদীঘি আর চন্দ্রভাগার তীরে এক গ্রামে বাস করত এমনই এক শিল্পী সনাতন। ছবি আঁকা ছিল তার প্রাণ। দিনরাত শিল ঘটায় রং ঘষে তুলি দিয়ে সে কেবল ছবিই আঁকত। ক্ষেতি জমি দেখাশুনা, ধান কলাই চাষ - সংসারের কোন কাজেই তার মন ছিল না বলে বুড়ো বাপের কাছ থেকে অশ্রাব্য গালি শুনে একদিন সনাতন নিরুদ্দেশ হয়। অনুতাপে বুড়ো বাপ কাঁদে। তিনমাস পর সনাতনের বাপ মারা যায়। কিন্তু মরবার সময় বুকে জড়িয়ে রাখে সনাতনের আঁকা পট। তারও কিছুদিন পরে সনাতন ফিরে এসে বুড়ো বাপের জন্য চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে। তারপর থেকে সে হয় গৃহী। জমি চাষ করে, ছবি আঁকে। কিন্তু বিয়ে করেই সনাতন পড়ে বিপদে। কলহ কুশলা বউ তার ছবি আঁকার কাজে বাদ সাধে। একদিন রঙের বাটি উবুড় করে দেয় ছবির ওপর। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত সনাতন বউকে প্রচণ্ড প্রহার করে। পাড়ার লোকেরা ছুটে না এলে সেদিন সনাতন বউকে খুনই করে ফেলত। দ্বিতীয় দিনের ঘটনা আরো মারাত্মক। সেদিন স্ত্রীর চরম ব্যবহারে সে উত্তেজিত হয়ে তার মাথায় ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে। অবস্থাপন্ন শ্বশুর এসে তার বউকে নিয়ে যায় এবং সনাতনকে দেয় পুলিশে। কিন্তু জামাই বলেই জেলের মুখ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনল শ্বশুরই। তারপর থেকে সনাতন প্রাণে বেঁচে রইল ঠিকই, কিন্তু শিল্পী সনাতনের হল মৃত্যু। সে ছবি আঁকে না, কথা বলে না, কেবলই নিজেকে মনে করে খুনী। চন্দ্রভাগার তীরে কেয়াবনের ছায়ায় সে চুপ করে বসে থাকে। নদীর জল, আকাশের নবীন মেঘ আর দূরের ঝাউ বনের ওপারে কোনারকের মন্দিরের কালোচূড়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সব ছবি ছিঁড়ে ফেলে ক্ষেতখেরস্তিতে মন দেয় সনাতন। কিন্তু সমুদ্রের ঝড় বালিতে ঢেকে যায় তার ফসলের ক্ষেত। সেই দুঃখেই ঘরছাড়া হয়ে সনাতন ভুবনেশ্বর স্টেশনের পাণ্ডায় পরিণত হয়েছে। গোটা গল্পে সনাতনের ঘটনাবহুল জীবনেরই চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। শিল্পী সনাতনের জীবনের

ট্র্যাজেডীই গল্পটির ঘটনা প্রাধান্যর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

'দোসর' গল্পে এক উদ্বাস্তু ভদ্রলোকের ঘটনাবহুল জীবনকাহিনী অভিব্যক্ত হয়েছে। উদ্বাস্তু হয়ে শিয়ালদা ক্যাম্পে এসে যখন তার বউ মরে কলেরায়, ছেলে মেশে চিন্তুকের দলে এবং মেয়ে হয় চিরতরে নিরুদ্দেশ তখন জীবনের কোন অবলম্বনই আর তার থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে দু বছর বাস করে সরকারের কাছ থেকে লোন দিয়ে ব্যবসা করেছিলেন তিনি, কিন্তু সে ব্যবসা ছ'মাস টেকেনি। ভদ্রলোক বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেলেন আসামে। সেখানে পাহাড়ের ঢালে বাসা বেঁধে জমিতে ফলালেন সোনা। কিন্তু প্রথমে সরকারী নোটিশ এবং শেষ পর্যন্ত হাতী দিয়ে ঘর ভেঙেতাকে করা হল উৎখাত। আসাম ছেড়ে ভদ্রলোক ছুটে এলেন আবার বাংলাদেশেই। শহরের বাইরে এক পাহাড়ী নদীর চড়ায়, কাশ, শন, ইকরার জঙ্গল ভেঙে করলেন ঘর, চাষ করলেন শাক সবজি। কিছুদিনের মধ্যে সেখানেও আবির্ভাব হল বুনো শুয়োরের, তবে শত্রু নয়, মিত্ররূপে। ঘরবাড়ি, প্রিয়জন হারিয়ে ভদ্রলোক যেমন একা, চেনা জঙ্গল আর আপনজন হারিয়ে শুয়োরটিও তেমনি একা। কিন্তু একদিন সেখানেও শহর থেকে শোলার টুপি আর হাফ প্যান্ট পরা বন্দুকধারী দু'তিন জন ভদ্রলোক এসে শুয়োরটিকে হত্যা করতে চায়। ভদ্রলোক শুয়োরের কথা চেপে গেলেন। শুয়োরটিকে না পেয়ে তিন ভদ্রলোকই ফিরে গেলেন, কিন্তু সরকারকে না জানিয়ে খাসমহল জমি ভোগ করার অপরাধে ভদ্রলোককে শাসিয়ে গেলেন। তার কয়েকদিন পরেই আসে বেকিয়ুৎ তলবের নোটিশ। তারপর সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল যখন পাহাড়ী নদীর বন্যা চড়াডুবিয়ে ভদ্রলোক ও শুয়োর দুজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্য! শুয়োরটি ভদ্রলোককে বাঁচাতে গিয়ে স্রোতের জলে সাঁতার কেটে কেটে শেষ পর্যন্ত নিজে আর উঠতে পারেনি, কিন্তু ভদ্রলোককে ডাঙায় ঠেলে দিয়েছে। এ গল্পে বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে ভদ্রলোকের জীবনের সব আশ্রয় দূরে সরে গেছে। অবশেষে একটি পশুই তাঁকে নিজের প্রাণের বিনিময়ে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ঘটনাপ্রধান

গল্প হিসাবে এ গল্প সার্থক বলা যায়। শুধু ঘটনাই নয়, গল্পের সঙ্গে মানুষের অন্তরের যোগসূত্রটিও গল্পে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

একটি চিঠির মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে 'পুষ্পধনু' গল্পটি। কিন্তু ঘটনা প্রাধান্যই গল্পটিতে প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের নায়ক বন্ধুর বিয়েতে এসে যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছিলেন, বিয়ের দিন সময়মত এসে পৌঁছুতে পারেননি বলে তাকে বিয়ে করতে পারেননি। সিন্ধি হয়ে মাঝিরা পথ ভুল করে অনেক পিছিয়ে পড়েছিলবলেই এই বিভ্রাট। কিন্তু মেয়ের বাবা লগ্নভ্রষ্টা হওয়ার আশঙ্কায় গ্রামের এক অকর্মা ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলেন। তারপর নায়ক আর বিয়ে করেননি। গ্রামের স্কুল মাস্টারী ছেড়ে চলে এসেছেন কলকাতায়। মেসে থাকেন, টিউশানি করেন, আর সঞ্চয়িতা খুলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন। এরপরে তার মা মারা গেলেন। মায়ের কাছে নায়ক কথা দিয়েছিলেন বিয়ে করবেন। ঘটনাক্রমে তাঁর সেই ইচ্ছে অবশ্য পূর্ণ হয়েছিল। এদিকে মেয়েটিও দেশবিভাগের পর তার অপদার্থ স্বামীর সাথে কলকাতায় চলে এসে ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। তার শয়তান স্বামীই একদিন তাকে কালীঘাটে নিয়ে যাওয়ার নাম করে একটি নীলরঙের মোটরে তুলে দেয়। তারপর খবরের কাগজে নায়ক একদিন দেখলেন - পূর্ব কলকাতার কোন এক হোটেলে পাপব্যবসার অভিযোগে পুলিশ হোটেলের মালিক ও তিনটি মেয়েকে গ্রেপ্তার করেছে। তার ভেতরে লগ্নভ্রষ্টা মেয়েটির নামও ছিল, আর ছিল তার স্বামীর পদবী। যথারীতি মামলার দিনে স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে নায়ক আসেন কোর্টে। হাকিমের কাছে জবানবন্দীতে সে জানিয়েছে তার স্বামীর অপদার্থতার জন্যেই তার এই অধঃপতন। তাই ভবিষ্যতে ভদ্রভাবে থাকবার মুচলেকা দিয়ে সে বেরিয়ে আসে কোর্ট থেকে। এই দৃশ্য দেখে নায়ক বাড়ি ফিরে গিয়ে সারারাত ভাবলেন। পরদিন দুপুরে কোর্টে এসে উকিলের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে মার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের পথ করে নিলেন তিনি। স্থির করলেন - জীবনে যে শুভক্ষণে তিনি তাঁর

নায়িকাকে হারিয়েছিলেন, নূতন শুভ লগ্নে তাঁকে তিনি জয় করে নেবেন। এই কারণেই তিনি ভাবলেন, তাঁর সেই শুভক্ষণের হারানো নায়িকার জীবনে যারা এসেছিল তারা দুজনের মাঝখানে হঠাৎই এসে পড়েছিল। তাই হোটেলের মালিকের মতো আর কেউ তার জীবনে এসে পড়ার আগেই নায়ক তাঁর কেটু যাওয়া-খুটি রোডের টিনের ঘরে তাকে তুলে আনবেন বলে ঠিক করলেন।

'জরতী' আরেকটি উৎকৃষ্ট ঘটনাপ্রধান গল্পের দৃষ্টান্ত। গল্পটিতে আছে অমিয় মিত্র আর শেফালী ব্যানার্জির কাহিনী। মোহন বাগানের খেলার মাঠের মতোই যার জীবন, তাসের আড্ডায় ট্রিকস করেই যার দিন কাটে আনন্দ চঞ্চলতায় এমন অমিয় মিত্র কলকাতার গলিতে ডেকে আনত ছেলেবেলার দিন। শেফালী ব্যানার্জী নামে বত্রিশ বছরের এক বিধবাকে দেবরদের হাত থেকে বাঁচাতে অমিয় তাঁকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেছিল। কিন্তু তার যৌবন দিয়ে অমিয় শেফালীকে দীক্ষা দিতে পারেনি, পাঠ নিয়েছিল শেফালীর বার্ধক্যের। তাই শেফালীর রিকেটী ছেলেটাকে আঁকড়ে ধরে মনের মতো মানুষ করতে চয়েছিল অমিয়। শেফালী তা সইতে পারেনি বলেই পশ্চিমের এক শহরে চলে আসে। সেখানে তার রিকেটী ছেলেটি মারা যায়। সেলাই আর গানের স্কুলের শিক্ষকতা করে দিন কাটে শেফালীর। আসলে শেফালী অমিয় মিত্রর জীবনের ট্র্যাজেডী সইতে পারেনি বলেই পালিয়ে এসেছিল এতদূরে। গল্পটি ঘটনাপ্রধান, কিন্তু এর ভাবাত্মক এক-মুখিতা গল্পটিকে অপূর্ব ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলেছে। এই কারণে দীর্ঘ গল্প হয়েও এ গল্পের আকর্ষণী শক্তি তীব্র।

'মুক্তির' গল্পে রতনপুর কোলিয়ারীর নতুন ডাক্তার সুবীর গুপ্ত রোগীদের সুচিকিৎসার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন বলেই ম্যানেজার হেমেন সরকারের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন। নার্স দীপার সাথে ডাক্তারের অন্তরিকতা এবং কুলী বিলটুকে ধাদের ধুম থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসা করে বাঁচিয়ে তোলার ঘটনায় হেমেন সরকার রেগে আগুন। ডাক্তারের সাথে মেলামেশার

কথা তুলে হেমেন সরকার একদিন দীপাকে করলেন অপমান । অপমানিতা দীপা কাজ ছেড়ে চলে যেতে চাইলে স্টেশন থেকে তাকে ফিরিয়ে এনে ডাক্তার করলেন বিয়ে । তখনকার মতো সমস্যার হল সমাধান । কিন্তু হেমেন সরকারের রাগ তাতে পড়েনি । কিছুদিন বাদে হাসপাতালে ডাক্তারের নামে এল বিরাট এক এক্সরে মেশিন । এই ঘটনায় অডিটরের কাছে তহবিল তছরুপের দায়ে অভিযুক্ত ডাক্তারের বিচারে হল তিন বছরের জেল । কিন্তু আসল ঘটনাটি ছিল অন্যরকম । একদিন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মোটর দুর্ঘটনায় আহত চিত্রতারকা মালিনী দেবী ও প্রোডিউসারকে স্টিচিং ও চিকিৎসা করে ডাক্তার সুস্থ করে তুলেছিলেন । কলকাতা থেকে ডাক্তার এসে মালিনী দেবীর স্টিচিং এর প্রশংসা করলেন । মালিনী দেবীও ডাক্তারের সেবা পরায়ণতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন । তিনিই পাঠিয়ে ছিলেন সেই এক্সরে মেশিনটি । তাই খবরের কাগজে ডাক্তারের শাস্তির ব্যাপারটা জেনে মালিনীদেবী নিজেই এসে একথা হেমেন সরকারকে জানিয়ে যান । নির্দোষ ডাক্তারের মুক্তির দাবীতে কুলীরাও করল আন্দোলন । হেমেন সরকার তাদের দাবী মেনে ডাক্তারকে মুক্ত করলেন । শুধু তাই নয়, ডাক্তারের জন্য করে দিলেন ল্যাবরেটরী । কিন্তু এই মিথ্যে অভিযোগের আঘাতে ডাক্তার চেতনা হারালেন । পরবর্তীতে দীপার সাধনাতেই তাঁর চেতনা আবার ফিরে আসে ।

'তৃণ' গল্পটিও ঘটনাপ্রধান । দিনাজপুরের দক্ষিণাঞ্চলের শান্ত নির্বিরোধ ধাওয়ারা অতি কষ্টে বিলের মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করলেও থানার কনস্টেবল, দারোগা ও মাসনপুরের শাহুদের অত্যাচারে তাদের জীবনধারণ দুষ্কর হয়ে পড়েছিল । তবু সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধাওয়াপাড়ার বসির আর সৈফুদ্দিন অতিকষ্টে বিলের মাছ ধরে কোনরকমে ছিল বেঁচে । কিন্তু হাসান শাহুর বাড়িতে শহর থেকে মৌলানা সাহেবের আগমনে খাস বরকন্দাজ পীরু এসে বসিরের ওপর রাগ দেখিয়ে বড় বোয়াল মাছটি নজরানা হিসেবে বেঁধে তুলে নিয়ে চলে যায় । এই ঘটনায় বসিরের চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে

চায় । শুধু তাই নয় , তাকে দুর্বল জেনে সুন্দর চেহারাধারী প্রতারক পাইকার তার স্ত্রী রোমেনাকে প্রাসাদবাসিনীর লোভ দেখিয়ে আকৃষ্ট করে নিতে চায় । বশির তাকে সন্দেহ করে । একদিন পাইকারের পরামর্শেই সে মৌলানা সাহেবের দরবারে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসে হাসনপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় । এদিকে পীরু মিঞা এসে বশিরকে জানায় রোমেনাকে ছেড়ে দিতে , কারণ রোমেনার উপর হুজুরের নজর পড়েছে । পীরুর এই অসংযত কথায় উত্তেজিত বশির পীরুকে লক্ষ্য করে দা ছুঁড়ে মারে । একটুর জন্যে পীরু বেঁচে যায় । তারপর আত্মরক্ষার তাগিদে পাইকারের পরামর্শে বশির হাসনপুরের উদ্দেশ্যে রোমেনাকে নিয়ে বিলের ঘাটে এসে দাঁড়ায় । সঙ্গে থাকে পাইকার । জঙ্গল এড়িয়ে পথ সংক্ষেপ করে বশির নৌকোকে নালার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে তা হঠাৎ আটকে যায় । জলের নিচে জালকিনার ভেতরে মাছ আটকেছে ভেবে বশির জলে নামে । এই অবসরে লগির ঘায়ে নৌকোকে নালা ছাড়িয়ে বিলের মুখে নিয়ে আসে পাইকার । আর আনাদ. মেছিয়োর কামড়ে বশির আর্ত চীৎকার করে পাইকারকে ডাক দেয় । চীৎকার করে রোমেনাও । কিন্তু শান্ত সুরে পাইকার বলে - বিবিজান , মানুষতো আর চিরকাল বাঁচে না । এগল্পের ঘটনাপ্রাধান্যের মধ্য দিয়ে শোষিত নির্যাতিত অত্যাচারিত খাওয়াদের জীবনের ক্রন্দনধ্বনিকেই যেন লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন ।

'প্রদীপ ও প্রজাপতি' গল্পে সোনা পিসীমার মৃত্যুর পর টুনু বৌদি বঙ্কুদার সঙ্গে থাকবার জন্যে চলে এসেছিলেন কলকাতায় । কামনা করেছিলেন একটি সুন্দর গুছনো সংসার । কিন্তু তাঁর জীবনে সে আশা মেটেনি । বাগবাজারের হরিহর দাস বাইলেনের বদ্ধ নোংরা পরিবেশে , খোঁড়া মুখরা বাড়ি উলির চুনসুরকিখসা পুরনো একতলা বাড়ির ভাঁড়াটে হয়ে তাঁদের জীবন কাটে বড়ই কষ্টে । স্বামী চাকরী হারিয়ে দুবেলা টিউশানি করেন । টুনু বৌদির চেহারা ভেঙে অস্থিচর্মসার কঙ্কালে পরিণত হয়েছে এবং ভাঁড়াটে বাড়ির দূষিত আবহাওয়ায়

তিনি নিজে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। একটা ছেলে হয়েছিল, কিন্তু রক্ত-আমাশায় ভুগে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক 'প্রদীপ ও প্রজাপতি' গল্পে টুটু বৌদির জীবনের সব স্বপ্ন কিভাবে ছারখার হয়ে গেছে তারই জীবন্ত অংকন করেছেন। সুতরাং ঘটনাপ্রধান গল্প হিসাবে এ গল্পের আবেদন মর্মস্পর্শী।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক গল্পই চরিত্রপ্রধান। চরিত্রপ্রধান গল্প-গুলিতে একটি ব্যক্তি-চরিত্রের বিকাশসাধনই গল্পকারের উদ্দেশ্য। "চরিত্রাত্মক গল্পগুলি ব্যাপক অর্থে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও নরনারী সমস্যার মধ্যে এসে পড়ে, তবু এদের নিজস্বতা আছে। একটি বিশেষ চরিত্রের চিত্ত স্বাতন্ত্র, তার একটি ক্রমাভিব্যক্তি এবং সর্বশেষে একটি অপরিজ্ঞাত অপূর্ব তার উপরে আলোকপাত এই ধরণের গল্পে থাকে।"[৩৪] বিশ্বের অনেক লেখকই চরিত্রপ্রধান গল্প লিখেছেন। চেকভের 'The Master' মোপাসাঁর 'Marrocco' গোর্কীর 'চেলকাশ' এবং সমারসেট মমের 'Mr. Know All' চরিত্রপ্রধান গল্পের দৃষ্টান্ত। বাংলা সাহিত্যেও অনেকেই লিখেছেন এ ধরণের গল্প। রবীন্দ্রনাথের 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', কাবুলিওয়ালা', 'অনধিকার প্রবেশ', তারাশঙ্করের 'অগ্রদানী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপেক্ষিতা', 'মৌরীফুল' প্রভৃতি গল্প চরিত্রপ্রধান। চরিত্র প্রধান গল্পরচনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র প্রধান গল্পের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করা গেল।

চরিত্রপ্রধান গল্পের সুন্দর দৃষ্টান্ত 'বীভৎস'। কমিশনের লোভে আসামের চা বাগানের জন্যে কুলী যোগানের কাজে ব্যস্ত সাধুবেশী সুন্দরলালের শঠ চরিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। আসলে সে সাধু নয়, অথচ সাধুর ছদ্মবেশে ভুটানী খচ্চরের পিঠে চেপে সহজসরল সাঁওতালদের মধ্যে ঘুরে

- -

৩৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যে ছোটগল্প 'শ্রাবণ', ১৩৮৪, ৫ম সংস্করণ, ডি.এম. লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা - ৩১৮

বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে ।'সুন্দরলাল বুদ্ধিমান লোক । তাই তিরিশ বছর না পেরোতেই সংসার ছেড়ে শুরু হয়েছে তার অগস্ত যাত্রা[৩৫] । সুন্দরলাল গেরুয়া নেয়নি , কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে সাঁওতালদের মনের ওপর রীতিমতো স্থান করে নিয়েছিল। সুরন সাঁওতালদের হাত দেখে , শিকড় - বাকড় আর কঠিন রোগের ওষুধ দিয়ে সে অবার্থ ক্রিয়া দেখাতে পেরেছে । শৈব , রামায়েৎ , গানপৎ কোনটাতেই তার বিদ্বেষ নেই । বোমভোলার নামে সে গাঁজার কলকেতে দম দেয় , সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে । শিঙবোঙার পুজোয় মুর্গী বলি দিলে প্রসাদ নেয় । এই ভাবেই ক্রমে ক্রমে সাঁওতালদের মন সে জয় করে নেয় । সুন্দরলাল ভূত ঝাড়তেও জানে বলে ভান করে , ঝড়ু সর্দারকে ভূত ঝাড়ার ব্যাপারে মিথ্যে গল্প বলতেও তার দ্বিধা নেই । নেপালের পশুপতিনাথের মন্দিরে বসে সে নাকি ধ্যান করে নাগাবাবারদেখা পেয়েছে । তাই ভূত , প্রেত , পিশাচ, দানো তার ছায়া দেখলেই ছুটে পালায় । ঝড়ু সর্দারের মেয়ে বুধনীকে আয়ত্ত করতেও সে কম কৌশল করেনি । সাঁওতাল মেয়েদের মধ্যে থেকে বুধনীকে ডেকে সে বিধান দেয় , 'তুই কেন এখানে পড়ে আছিস বুধনী । তোর যে ভারী জোর বরাত । নাগা বাবার কথা যদি সত্যি হয় , তাহলে শহরে গিয়ে যে তোর কপাল ফিরে যাবে এতো আমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি । ... চলে যা চলে যা তুই । দেবতার নাম করে বলছি তুই চলে যা । শাড়ি , চুড়ি , তেল , যা চাস সব পাবি ।'[৩৬] সুন্দরলাল এমন ভাব দেখায় যেন তার ওপরে ঠাকুর দেবতা ভর করেছে । বুড়ো মোঝি টুডুকে সে তাই হাপানীর ওষুধ বাতলে দেয় । পাহাড় থেকে হরিণের পাল নেমে এসে গম খেয়ে গেলে তার প্রতিকারের জন্যে সাঁওতালরা ছুটে আসে তার কাছেই , বড়কা সাঁওতাল কোন এক সাঁওতাল মেয়ের কপালে সিঁদুর লেপে দিয়েছে অথচ সমাজের

- -

৩৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -১ (গল্প : বীতংস), ২য় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , পৃষ্ঠা - ৫৫৩

৩৬. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -১ (গল্প : বীতংস), ২য় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ , ১৩৮৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , পৃষ্ঠা - ৫৫৮

আইনে তাদের বিয়ে হতে পারে না — তার বিধান দেবে সুন্দরলাল। কারো পায়ের ঘা তিনমাস হল সারছে না কেন তারও কারণ বাতলে দেবে সে। পিশাচ চালনাতেও নাকি সে ওস্তাদ। কিন্তু শুধু চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকবার জন্যে সুন্দরলাল আসেনি। তাই দু মাসের মধ্যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে সে অনেক ছলনার আশ্রয় নেয়। বিলি সাঁওতাল যখন মানসিক পালনের জন্যে শালবনের মাঝখানে মুর্গী আর মহুয়ার মদে শিঙ বোঙার পুজো করছিল তখন খচ্চরে চড়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে তার উপর শিঙ বোঙার ভর উঠেছে ভাব দেখিয়ে সে বীভৎসভাবে পৈশাচিক নাচ শুরু করে দেয় এবং অপ্রকৃতিস্থ ভাবেই দৈববাণী করে জানিয়ে দেয় — করম দেবতার কোপে গাঁয়ে মড়ক লাগবে, একটি প্রাণীও তার হাত থেকে বাঁচবে না। কিন্তু নাগা বাবার শিষ্য সাধু সুন্দরলালের সঙ্গে উত্তরে চলে গেলে এই বিপদ থেকে তারা রক্ষা পাবে। শেষ পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে সুন্দরলাল বেয়াল্লিশ জন সাঁওতালকে নিয়ে এগিয়ে গেছে আসামের চা বাগানের দিকে। সুসাধনের লোভ আর করমদেবতার হুকুম মেনে অনুসরণ করেছে সাঁওতাল মেয়ে বুধনীও। একজন লোভী, স্বার্থপর, প্রতারক, হীন চরিত্র হিসাবে লেখক সুন্দরলাল চরিত্রটি ভালো ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

রায়বাহাদুর এইচ.এন.চ্যাটার্জীর আভিজাত্য গর্বিত চরিত্রটি 'হাড়' গল্পে উদ্ঘাটিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলিতে একদিকে কলকাতার আকাশে জাপানী দস্যুর আক্রমণ আশংকা, দুর্ভিক্ষের ফলে মনোহরপুকুর পার্কের রেলানী থেকে বুভুক্ষু মানুষের চীৎকার, ক্লথের মধ্যে মানুষ জিভ দিয়ে চেটে খায় ম্যানহোলের নোংরা জল, অন্যদিকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মোটর, ট্রাম আর মানুষের অবিশ্রান্ত স্রোতধারার পাশে রায়বাহাদুরের প্রাসাদ, গেটের করালদর্শন কুকুর, গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার উগ্র মধুর সুরভি, অ্যাসফল্টের রাস্তা, কালো মার্বেল বাঁধানো সিঁড়ি, রঙীন কাঁচদেওয়া জানলা, সিল্কের পর্দা, চীনে মাটির টবে

অর্কিড এই সবই রায়বাহাদুরের আভিজাত্যের প্রতীক। বংশ প্রধর এম.এ. পাশ বেকার ছেলের চাকরী প্রত্যাশা তার কাছে মূল্যহীন। সমাজে আভিজাত্যের শীর্ষ দেশে অধিষ্ঠিত রায় বাহাদুরের কাছে তা যেন উপহাসের সামগ্রী। তাই আলোচনার সময় ছেলেটি যখনই চাকরীর প্রসঙ্গ তুলেছে তখনই রায়বাহাদুর তাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। রায়বাহাদুরের কাছে জীবন হল অ্যাডভেঞ্চারের সামিল। ছেলেটিকে তিনি কেরাণীগিরি চাকরীর বাসনা প্রত্যাখ্যান করে অ্যাকটিভ-সার্ভিসে নেমে পড়বার কথা বলেছেন। বলেছেন – নেভিতে যোগ দিতে। তাঁর নিজের জীবনেও তিনি এই অ্যাডভেঞ্চারের জন্যেই অনেক স্থান ভ্রমণ করেছেন। সিঙ্গাপুর, হাওয়াই, ম্যানিলা, তাহিতি, ফিলিপাইন ও জাপানে গিয়ে পৃথিবীকে চোখ মেলে দেখেছেন তিনি। হাওয়াইয়ের হুলাহুলা ড্যান্স, স্টিভেনসন ব্যালেন্টাইনের প্রবাল দ্বীপের দেশ, আর ফিলিপাইনের যাদুবিদ্যার সাথে পরিচিত হয়ে তিনি সংগ্রহ করেছেন কত ছোট বড় হাড়। প্রশান্ত মহাসাগর, মিন্ডানাও দ্বীপ থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন অর্ধেক মানুষ অর্ধেক গরিলার আকৃতিবিশিষ্ট বোর্ডেশিয়ানের হাড়। আসলে দুর্ভিক্ষের দিনে মানুষ যখন চরম বিপর্যয়ে দিন কাটায় মনোহরপুকুর পার্ক থেকে ভেসে আসে ক্ষুধার্তমানুষের অবিচ্ছিন্ন চিৎকার তখন রায় বাহাদুরের মতো আভিজাত্য গর্বিব মানুষের তাতে এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই। পরিবর্তে রায় বাহাদুরের হাতের আঙুলের উজ্জ্বল হীরে, কুমারী মেয়ের সেই হাড়, ঘরের নীল পর্দা, বৈদ্যুতিক আলো, ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধ, পাইপ, তামাকের গন্ধ, ভেলভেটের বাক্স্ থেকে উঠে আসা ওষুধের গন্ধ – এসবই যেন তাঁর বিলাসিতাময় আভিজাত্যখচিত জীবনকে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত বুভুক্ষু মানুষকে তিনি ঘৃণা করে বলেন, "পার্কের ওই ডেস্টিচ্যুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমোনো যায় না। বোধহয় খাবার দাবার কিছু মিলেছে – তাই এই চিৎকার। খেতে না পেলেও চীৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই।" ৩৭ আভিজাত্য গর্বিত রায়বাহাদুর চরিত্রটি তীব্র ব্যঙ্গের

---

৩৭. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী - ১(গল্প - হাড়), অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮, ২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ. ৩৬৯

মধ্য দিয়ে এইভাবেই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে । চরিত্রপ্রধান গল্প হিসাবে এখানেই গল্পটির সার্থকতা ।

বস্ত্রব্যবসায়ী দেবী দাসের চরিত্রের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছেন 'দুঃশাসন' গল্পে । বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের দিনে চরম বস্ত্র সংকটে অসহায় ও নিরূপায় মানুষ তার কাছেএক জোড়া কাপড়ের জন্য কাতর আবেদন করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয় । পাকা ব্যবসায়ী দেবী দাস, তাঁর ভাইপো গৌর দাসকে ভ্রূভঙ্গি করে বলেন, " ওকে একখানা দিলে দুঘন্টার মধ্যেই দোর গোড়ায় উল্টো চন্ডীর মেলা বসে যেতো না ? ও ব্যাটাদের কাছ থেকে এক পয়সাও তোর আর বেশি নেবার উপায় নেই । পরপর কতগুলো মামলা হয়ে গেল দেখছিস না ?' [৩৮] গঞ্জ বন্দরের একজন বড় ব্যবসায়ী দেবী দাস । কাপড়ের আড়ত আছে । খুচরা ও পাইকারী দুভাবেই বিক্রী করে । আট দশ খানা হাট তারই কাপড়ের ওপর নির্ভরশীল । বস্ত্র সংকটের দিনে সরকারী দরে কাপড় বেঁচে লাভ নেই, তাই দোকানে তিনি লাগিয়ে দিয়েছেন জবর তালা । সাধারণ মানুষের প্রতি এত নির্দয় হলেও তিনি থানার দারোগা পচাকড়িবাবু আয়োজিত যাত্রার জন্যে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা ভয়ে ভয়েই দিয়ে দেন । কারণ দারোগা পুলিশকে সন্তুষ্ট না রাখলে তাঁর কার্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটবে । থানায় যাত্রার আসরে গ্রামের অর্ধনগ্ন, অর্ধভুক্ত, জীর্ণ - শীর্ণ মানুষ এসেছেন দর্শক হয়ে, এসেছেন ভাইপো গৌরদাসকে নিয়ে দেবী দাস । 'দুঃশাসনের রক্ত পান' পালায় দুঃশাসনের রক্তরঞ্জিত হাতে ভীম দ্রৌপদীর বেণী বেঁধে দিয়েছিলেন । কিন্তু এ পালা যেন দেবীদাসের মতো বস্ত্র ব্যবসায়ীর নির্লজ্জতার মুখোসটিকে প্রকাশ্যে টেনে খুলে দিয়েছে । হাজার হাজার বছর আগে মখাভারতের দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিল, দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলা দেশেও সেই একইরূপ ।

- -

৩৮. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -২ (গল্প - দুঃশাসন) মাঘ, ১৩৮৮, ২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা -৪৩৮

দেবী দাসের মতো বস্ত্র ব্যবসায়ী এ যুগের মেয়েদের বস্ত্র হরণ করে নিয়েছে। ঘুঁটি পাড়ার ঘাটে বিবস্ত্রা ষোড়শী কিশোরীর চকিত আবির্ভাব ও মানুষের সাড়া পেয়ে আড়ালে লুকিয়ে পড়ার দৃশ্যে সেই চিত্রটি ফুটে উঠেছে। যাত্রার আসরে দুঃশাসনের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিল ভীম। দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলাদেশের মানুষও বুঝি দেবী দাসকে ক্ষমা করবে না — এই আশঙ্কাতেই যাত্রার আসর থেকে বেরিয়ে আলের পথে চলতি লোকজনের হাতে ধারালো হেঁসো দেখে দেবী দাসের ভয় হয়-এই সব মানুষ বুঝি প্রতিশোধ নেয় তার অপরাধের।

'মমি' গল্পে জমিদার রত্নেশ্বর রায় রায়বংশের চিরাচরিত পথ ধরেই একদিন অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত জীবন যাপন করেছিলেন। রত্নেশ্বর বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, কুৎসিত ব্যাধিতে তাঁর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, বিকৃতি ধরেছে নাকে, শরীরের মাংস শুকিয়ে চামড়ার আবরণ ভেদ করে মোটা হাড়গুলো যেন বেরিয়ে আসতে চায়, লিভারে দেখা দিয়েছে সিরোসিস। আভিজাত্যের অগ্নিজ্বালায় নিজেকে নিঃশেষে দহন করে পাঁচ বছর ধরে তিনি বেঁচে আছেন। কিন্তু তার অতীত যৌবনের ভেনাসের মূর্তি ও আদর্শ পিতৃপুরুষ রামেশ্বর রায়ের বিবর্ণ তৈল চিত্র তাঁর উচ্ছৃঙ্খল আভিজাত্যের স্মৃতিটুকু ধরে রেখেছে। একদিন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের নিয়ে তিনি বাগান বাড়িতে রাত কাটাতেন। পত্নীর মৃত্যুর পর তরুণী জয়া তাঁর বহির্মুখী যৌবনকে [illegible] নিয়ন্ত্রিত করত। নায়েব ত্রিভুবনের সঙ্গে তিনি উন্মত্ত রাত কাটিয়েছেন বহুবার। বাইজীর স্খলিত বস্ত্র বিপুল নৃত্যলীলার সঙ্গে যখন জড়িত কণ্ঠ বাহবা দিয়ে গেছেন তিনি, তখন দু হাতে তবলা ঠুকেছে ত্রিভুবন। নেশার প্রগাঢ় আচ্ছন্নতায় পরস্পরকে জড়িয়ে একই ফরাসের ওপর দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বার্ধক্যের ভারে ক্লান্ত রত্নেশ্বরের বস্তুবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ পুত্র মণীন্দ্র তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত। মণীন্দ্র রত্নেশ্বরের উচ্ছৃঙ্খল আভিজাত্যপূর্ণ অসংযত অনিয়ন্ত্রিত জীবনের বাঁধা পথের যাত্রী নন। ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদকে নির্মূল করে নতুন পৃথিবীতে সূর্যালোকিত নতুন দিন বয়ে আনার স্বপ্নে সে বিভোর। রত্নেশ্বরের ক্ষমতা নেই তাঁকে বশ করার।

পুত্র মণীন্দ্রর আমলে তাই বন্ধ হয়েছে জয়ার মাসোহারা , প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ত্রিভুবন নায়েবের । রত্নেশ্বর দেহে মনে বৃদ্ধ , তবুও তাঁর উদ্দাম যৌবন আর অতীতের রোমাঞ্চিত জীবনকে ফিরে পাওয়ার জন্যে তিনি মরফিয়ার ইনজেকশন নেন । রামেশ্বর রায় , মদনমোহন রায়ের বংশধর তিনি । তাই পুত্র মণীন্দ্রকে রায় বংশের বাঁধা পথে ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাঁর সঙ্কল্প । কার্তিকী অমাবশ্যার রাতে মণীন্দ্রর হাত ধরে মাতির মতো হাঁটতে কুলদেবতার সামনে এসে তিনি মণীন্দ্রকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে চান । কিন্তু নতুন যুগের মানুষ ও দেববিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ মণীন্দ্রকে তিনি রাজী করাতে পারলেন না । দুঃখ বেদনায় ব্যর্থ অসহায় রত্নেশ্বর কেঁদে ফেললেন । মণীন্দ্রর হাত ধরেই তাঁকে ফিরে আসতে হয় । পুত্র মণীন্দ্রকে রায় বংশের বাঁধা সড়কে টেনে আনবার জন্যে বৃদ্ধ জমিদার রত্নেশ্বরের হৃদয়ের আকুলতা , তাঁর অতীত জীবন ও পুত্র মণীন্দ্রর নবজীবনবোধ সব মিলে গল্পটি একটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র প্রধান গল্পে পরিণত ।

'চারতলা' গল্পে অগ্নিহোত্রী পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর নিরঞ্জন চ্যাটার্জীর আদর্শভ্রষ্টতার পরিচয় মেলে । অগ্নিহোত্রী পরাধীন দেশের নামকরা কাগজ । অনেক আত্মত্যাগে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । অনেস্ট জার্ণালিজমের আদর্শকে পাথেয় করে শশধর, শ্যামানন্দ , শ্রীপতি , অজয় আর নিরঞ্জন যখন এ পত্রিকা প্রথম বের করে তখন পত্রিকার বিক্রী ছিল মাত্র সাতাশখানা । কিন্তু বিশ বছর পরে তা সাতান্ন হাজারে পৌঁছেছে । তারপর পুলিশের গুলিতে বিপ্লবী শশধরের হল মৃত্যু । শ্যামানন্দ , শ্রীপতি ও অজয় খাটে জেল । কিন্তু নিরঞ্জন বেঁচে যায় । পরবর্তীতে আরো কয়েক জন আদর্শবাদী ছেলের সহযোগিতায় অগ্নিহোত্রী বাংলার সংবাদপত্র জগতে মহাবিপ্লবের বাণী বহন করে আনে । কুলি , মজুর , কেরাণী , দেশের নির্যাতিত মানুষ টাকা দিয়ে বাঁচিয়ে তোলে পত্রিকাকে । ফলে এই সমস্ত মূক মানুষের রক্ত রাঙা জীবনের মর্মকাহিনী বহন করে 'অগ্নিহোত্রী' আবার দেশকে ডাক দেয় । ক্রমে পত্রিকার চাহিদা দ্রুত বেড়ে যায় । কিন্তু

রাজদ্রোহের অপরাধে প্রথমে পাঁচশো ও পরে হাজার টাকা জরিমানা হল পত্রিকার। দশ হাজার টাকা জামানত ও দরকার হল। নিরঞ্জনকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে প্রবীর। শ্রমিক, মজুররা পত্রিকাকে আবার বাঁচিয়ে তোলে। কেউ দিলে একদিনের মজুরী, কেউ দিল পাঁচ আনি সোনার মঙ্গল আংটি। আবার, নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে প্রবীর যখন পত্রিকাকে বাঁচাতে পারেনি তখন পত্রিকার সম্পাদক নিরঞ্জন চ্যাটার্জী এক ধনকুবেরের চেকের অঙ্কের লোভ সামলাতে পারেনি। লাঞ্ছিত সর্বহারা মানুষের প্রতিনিধি 'অগ্নিহোত্রী' পত্রিকার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নিরঞ্জন বিশ্বাস ঘাতকতা করল। প্রবীর প্রতিবাদ করে বলেছিল, ''আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন - আপনি বিট্রেয়ার।" [৩৯] নিরঞ্জন বলেছিল, " এ আমারি কাগজ, আমি এর মালিক।' যা খুশি আপনারা করতে পারেন এখন।" [৪০] আদর্শভ্রষ্ট, বিশ্বাসঘাতক, নিরঞ্জনই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করল, আর প্রবীর কাগজ ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু দেশের মানুষের প্রতি সমস্ত কৃতজ্ঞতাবোধ ভুলে নিরঞ্জন পত্রিকাকে তার নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত করে। পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক হলেও সেই ধনকুবেরের জয়ঢাক পিটিয়ে সে ব্যাঙ্কে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে তোলে। বালিগঞ্জে কেনে জমি। আদর্শপ্রবন প্রবীর যখন বস্তির খোলা ঘরে ওষুধের অভাবে মুখে রক্ত তুলে মারা যায় তখন অফিসের পুরু কুশন আঁটা চেয়ারে বসে বসে সে তাঁর পরিবর্তিত জীবনের সুখ ভোগ করে। যে 'অগ্নিহোত্রী' পত্রিকা মানুষের ভাঙা চুরো, জরাজীর্ণ, বীভৎস নোংরা জীবনের বাণীকে প্রকাশ করবার জন্যে জন্ম নিয়েছিল ; ম্যানেজিং এডিটর নিরঞ্জন চ্যাটার্জীর অর্থলিপ্সার কারণে তার কোন মূল্যই আর থাকেনি। সাধারণ মানুষের জীবনের বাণী বহন করত অগ্নিহোত্রী, কিন্তু নিরঞ্জন চ্যাটার্জী তাকে তথাকথিত সুবিধাবাদী রাজনীতি বিদদের স্বার্থসিদ্ধির কাগজে পরিণত করেছিল। পণধর আর প্রবীরের রক্তের মূল্য সে দিতে জানেনি। পত্রিকাকে বড়লোকের স্বার্থবাহী করে তুলে নিরঞ্জন দেশের মানুষের প্রতি অমর্যাদা করেছে। বাড়ি, গাড়ী, দামী খাবার আর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হোয়াইট সিগারেট খেয়ে নিরঞ্জন চ্যাটার্জী তার জীবনের চারতলাতে নিজেকে স্থাপন করেছে। আদর্শভ্রষ্ট, বিশ্বাসঘাতক,

---

৩৯, ৪০ • নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -৬, (গল্প -চারতলা), শ্রাবণ, ১৩৮১,
২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ-৪২৮

দেশদ্রোহী নিরঞ্জন চ্যাটার্জির চরিত্রটিকে গল্পে এই ভাবেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চরিত্রপ্রধান গল্প হিসেবে এ গল্প তাই সার্থক।

'পিতরী' গল্পে বাবনাতলী বস্তির চল্লিশ টাকা মাইনের ফিটার সুধানাথের গরীবের সংসারে মেয়ে সত্যভামা ম্যাট্রিকে খুব ভালো ফল করে বৃত্তি পেয়েছে, তিনচারটে কলেজ থেকে তার আমন্ত্রণ এসেছে স্কলারশিপের। আর তার সঙ্গে এসেছে বড়লোকের ছেলে ধীরেন। ধীরেন বি.এ. পাশ। ছেলে হিসেবে সে খুব ভালো। একদিন ধীরেন আসবে বলে সুধানাথ বৈঠকখানা বাজার থেকে বাজার করে এনেছে। কিন্তু রাতে যখন ধীরেন এল তখন তার অসুস্থ স্ত্রীকে সত্যভামার সম্পর্কে সুধানাথ কি যেন বলে। সত্যভামা পুরোটা না শুনেও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে তার বাবার মানসিকতা। আসলে সুধানাথ চেয়েছিল বুড়ো বয়সে সত্যভামার ওপরেই নির্ভর করে বাঁচতে। তাছাড়া তার ছেলেও নেই, শরীর ও বেশিদিন টিকবে না। সুধানাথ সম্পূর্ণ স্বার্থপর। মেয়ে জীবনে কৃতি হয়ে উঠুক, বুড়ো বয়সে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে পিতৃঋণ শোধ করুক – এই আশাই ছিল সুধানাথের। কিন্তু তাঁর এই লোভের জন্য সত্যভামার জীবনথেকে সুখ, ভালোবাসা আর সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন যে মুছে যেতে বসেছে একথা সে এতটুকু ভাবেনি। শুধু তাই নয়, এর আগে সত্যভামার যখন দশ বছর বয়স তখনও বুড়ো হেডম্যানের হাতে তাকে গৌরী দান করে সুধানাথ একটা লিফ্ট পেতে চেয়েছিল। সত্যভামার মা গিরিবালা বাধা দিয়েছিল বলে অনেক পদাঘাত সইতে হয়েছিল তাকে। নিজের বার্ধক্যে সুখী দিনযাপনের মোহে কন্যার উপার্জনকে একমাত্র সম্বল হিসেবে আয়ত্ত করবার জন্যে সুধানাথ চরিত্রের যে নীচতার পরিচয় গল্পে স্থান পেয়েছে তাতে আজকের সমাজজীবনের একটি অন্তত চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। চরিত্রপ্রধান গল্পরূপে তাই 'পিতরী' গল্পের মূল্য কোন অংশে কম নয়।

চরিত্রপ্রধান গল্পের সার্থক দৃষ্টান্ত 'নক্তচরিত'। গোলাপাড়া হাটের আদরেল মহাজন নিশি কর্মকার। সোনাদানা, ধানচালের আড়ত ও কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে সে বড়লোক। সে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। ঘুষ অধর্মের টাকা গোরুও বলদের রক্তের অধিকারে জোতদের ঠকিয়ে কাঁচা সোনা, গয়না এবং নগদ টাকায় সিন্দুকের উদর সে ভরে তুলেছে। নিশি কর্মকার বৈষ্ণব। সারাদিন কাজে ডুবে থাকে বলে ব্রাহ্ম মুহূর্তে মালা জপ করে বেসুরো গলায় কীর্তন গেয়ে পুণ্যার্জন করে। অথচ বাঁড়ির মেয়ে বিশাখাকে সেবাদাসী করে গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে দেয়। শুধু বিশাখাই নয়, একটা সময় ছিল যখন নিশিকর্মকার গ্রামের সুন্দরী মেয়েদের অন্তত দুদিনের জন্য হলেও আয়ত্ত করত। ইব্রাহিম দারোগাকে ঘুষ দিয়ে সন্তুষ্ট রেখে তার ধান চালের মজুত ব্যবসা ভালোই চলে। আবার গোলাপাড়া হাটের মহাজনেরা হরিসভায় অষ্ট প্রহরের আয়োজন করলে নিশিকর্মকার তাতে চাঁদা দেয়, অষ্ট প্রহরের আসরে কীর্তনের তালে তালে তার সমস্ত দেহে জাগে কদম্ব কেশরের রোমাঞ্চ, প্রকটিত হয়ে ওঠে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব। কীর্তনের আসর থেকেই চৌকিদারের খবরে যখন সে ছুটে গিয়ে মতিপাল ও তার বউ এর মৃত্যুর দৃশ্য দেখে তখন মনে হয় নিশি কর্মকার একজন কর্তব্য পরায়ণ মানুষ। প্রকৃতপক্ষে মতিপাল ও তার বউয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর কারণ নিশি কর্মকারের মতো মানুষ। দুর্ভিক্ষের দিনে গোপনে চাল মজুত রেখে এরাই মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। ধান চাল মজুত রাখার ভয়ে সে ইব্রাহিম দারোগাকে টাকা দিয়ে বশ করে রাখত। কিন্তু তার বার্ধক্য ও দুর্বলতার সুযোগে ইব্রাহিম দারোগা শুধু তার কাছ থেকে টাকা পয়সাই নেয়নি, কৌশলে তার বিশাখাকেও আয়ত্ত করে নেয়। কিন্তু এইটিই তার একমাত্র শাস্তি নয়। আটশো মন চাল মজুত রেখে চল্লিশ টাকা মন দরে বাজারে ছাড়ার সুযোগ করে নিতে গিয়ে বর্ষার জলে তার গুদামের পঞ্চাশ হাট মন চালও পচে যায়।

'স্মাগলার' গল্পে মানব চক্রবর্তী এক অদ্ভুত চরিত্র। পুরনো জুতোর মতো তিনটি স্ত্রীকে অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করে রিফিউজী ক্যাম্প থেকে সে বিয়ে করে আনে শঙ্করীকে। পরিচয় আড়াল করার বিদ্যাতে সে পারদর্শী। আসলে সে একজন নামজাদা জুয়া চোর। সতের বছর বয়সে বিমাতার বিশ্রী ব্যবহারে গয়নার বাক্স্ নিয়ে বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং তারপর থেকে ঠকানোর ব্যবসায় দিন দিন সে সিদ্ধিলাভ করেছে। উজ্জ্বল গায়ের রঙ, চমৎকার চুল, ধারালো নাক আর ঝকঝকে দৃষ্টিশক্তি নিয়ে পোশাকে পরিচ্ছদে সে একজন খাঁটি ভদ্রলোক। দেখে মনেই হয়না ক্লাস টেন পর্যন্ত তার বিদ্যে এবং শেয়ার বেচা(?) চারশো কুড়ি ধারার সে নামজাদা আসামী ও দু'বার খেটেছে জেল। শঙ্করীকে নিয়ে বস্তিতে মুখ গুঁজে থাকলেও নিত্য নতুন, প্ল্যান করে সে মানুষকে ঠকিয়ে যায়। এই কারণেই নিজেকে তারাপদ দাস নামে গ্রাজুয়েট ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিয়ে সে চক্রবেড়ের প্রবীণ স্কুল শিক্ষককে আড়াইশো টাকার টিউশনি আর আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগের লোভ দেখিয়ে তার দামী জার্মান কলম ও ত্রিশ টাকা আত্মসাৎ করতে চায়। কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রান্ত দেশে এসে যখন পার্কস্ট্রীটের আমেরিকানদের বড়বাড়ির পাশে অপেক্ষমান শিক্ষক করুণাময়ের হাত থেকে চশমা পড়ে যায় ও চশমার অভাবে করুণাময় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে চীৎকার করে তাকে ডাকতে থাকেন তখন মানব চক্রবর্তী উত্তেজিত হয়ে ফিরে এসে তাঁর কলম ও টাকা ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু এই ঘটনাটিই মানব চক্রবর্তীর চৈতন্যে আঘাত হানে। এরপর থেকে সে ঠকিয়ে রোজগারের অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে পনের টাকা মূলধন দিয়ে লোকাল ট্রেনে টফি লজেন্স ফেরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতারক মানব চক্রবর্তী থেকে ভালো মানুষ মানব চক্রবর্তীতে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনীর মধ্য দিয়ে গল্পটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। চরিত্রপ্রধান গল্প হিসাবে এগল্প তাই শিল্পসার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে।

তরাইয়ের প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্বে রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুর এন আর, চৌধুরীর আদিম হিংস্র চরিত্রটি ধরা পড়েছে 'টোপ' গল্পে। রাজাবাহাদুরের হান্টিং বাংলো, নাউজেন রাইফেল, রিভলভার, লম্বা শেফিল্ডের তলোয়ার, মোটা চামড়ার বেল্টে ঝকঝকে পেতলের কার্তুজ, জরিদার খাপে নেপালী ভোজালি, দেওয়ালের গায়ে হরিণের মাথা, ভালুকের মুখ, বাঘ, সাপ, হরিণের গোসাপের চামড়া, টেবিলে অতিকায় হাতির মাথা সবই রাজা বাহাদুরের বীরকীর্তির নিদর্শন। তরাইয়ের অরণ্যে রাত্রির অন্ধকারে আদিম হিংস্রতা যখন বিরাজ করে তখন পেগপ্রসাদিত রক্তের উন্মাদনায় রাজাবাহাদুর শিকারের নেশায় মত্ত হয়ে ছুটে যান অরণ্যের গভীরে। কিন্তু তাঁর হিংস্র প্রবৃত্তি ছোটখাট শিকারে তৃপ্ত হতে পারেনি। আরো বড়ো শিকারের নেশা তাঁর মনে উগ্র হয়ে ওঠে। হান্টিং বাংলোর পেছনে যেখানে চারশো ফুট নিচে টেরাইয়ের অন্যতম হিংস্র অরণ্য বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে সেখানে রেলিং দেওয়া কাঠের সাঁকোতে বসে কপিকলের মাধ্যমে আছে তাঁর মাছ ধরার ব্যবস্থা। মাছ ধরাই নাকি তাঁর শ্রেষ্ঠ শিকার। আসলে মাছ ধরার ছদ্মনামে তা বাঘ শিকারের পাকা ব্যবস্থা। কিন্তু অত্যন্ত গোপনে রাজা বাহাদুর এই শিকার করেন। কারণ বাঘ শিকারের জন্যে যে টোপ তিনি ব্যবহার করেন তা মোটেই সাধারণ নয়। মানব শিশুর টোপ দিয়ে তিনি তাঁর শিকারের নেশা চরিতার্থ করেন। আর তার বলি হয় তাঁরই হিন্দুস্থানী কীপারের বেওয়ারিশ শিশু। এই শিশুটিকেই টোপ হিসাবে বেঁধে দুজন বেয়ারা দিয়ে কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে তিনি চারশো ফুট নিচে নামিয়ে দেন। ঝিঁঝির ডাক, হাতির গর্জন, পাতার মর্মরতা ছাপিয়ে চারশো ফুট নিচ থেকে উঠে আসে বাঘের প্রচণ্ড গর্জন। সঙ্গে সঙ্গে শিশুর গোঙানি। হুইস্কি আর ম্যানিলাচুরুটের নেশায় ও গন্ধে বিভোর রাজা বাহাদুরের আদিম হিংস্রতায় সেদিন তাঁরই হিন্দুস্থানী কীপারের বেওয়ারিশ শিশুটি বলি হয়েছিল। আর তার পরিবর্তে পেগপ্রসাদিত রক্তের চঞ্চলতা নিয়ে রাজাবাহাদুর তাঁর বাঘ শিকারের হিংস্রনেশা চরিতার্থ করেন। অরণ্য পরিবেশে রচিত 'টোপ' গল্পে

এই ভাবেই রাজাবাহাদুরের অদ্ভুত হিংস্র চরিত্রটি সহজেই উদ্ঘাটিত হতে পেরেছে । সুতরাং একটি ভয়াবহ শিকারের কাহিনী হয়েও 'টোপ' একটি সার্থক চরিত্রপ্রধানগল্প ।

'একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকা ' গল্পে লেখের নেশায় বিভোর নিত্যানন্দ চৌধুরীর গরীব প্রীতি সত্যিই হাস্যকর । বস্তির অসহায় মানুষের দুঃসহ জীবনযাত্রায় তার অন্তর বেদনাচ্ছন্ন , অথচ তাঁর নিজেরই একটা বস্তি ছিল টালীগঞ্জে । কিন্তু সেখানে শোর ভেড়ার মতো মানুষের জীবন । বস্তির অন্ধকারে কাদা নোংরার মধ্যে দমবন্ধ করা অবস্থায় মানুষের বীভৎস জীবনযাত্রার দিকে তাকিয়ে নিত্যানন্দ চৌধুরীর ভাষা বেদনাচ্ছন্ন । বস্তিবাসী মানুষের কথা চিন্তা করে তিনি বলেন যে তারাই হচ্ছে সভ্যতার বনিয়াদ , তারাই হচ্ছে কলকাতার প্রাণ । তারা মানুষের মুখে অন্ন যোগায় , কিন্তু তাদের অন্ন জোটে না, তারা মানুষের জন্যে আকাশ ছোঁয়া বাড়ি তৈরী করে দেয় , অথচ তাদের থাকবার জন্যে ভাঙা ঝোপড়ী । আসলে এই সবই তাঁর নকল সহানুভূতি , দামী বিলিতি মদের নেশার ফসল । তাছাড়া নিত্যানন্দ চৌধুরীর পরনে দামী সিল্কের জামা , ফরাস ডাঙার ধুতি , হীরের আংটি বিলাসিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছে । সুতরাং বস্তির গরীব মানুষের প্রতি সহানুভূতির ভাষা তাঁর মুখে বড়ই বেমানান । গল্পের বক্তাতো তাঁকে দৈত্যকূলে ছদ্মবেশী 'প্রহ্লাদ' বলে অভিহিত করেছেন । টালীগঞ্জে তাঁর নিজের বস্তিতে দুর্গত মানুষ অসহায় জীবনযাপন করেছেন , কিন্তু সেই বস্তিকে তিনি পুলিশ ডেকে উচ্ছেদ করেছেন । কারণ ব্যাধি সারাতে হলে নাকি মাঝে মাঝে শল্য প্রয়োগ করতে হয় । 'দুঃখী দুনিয়া' নামে একটি সিনেমার গল্প লিখে দেবার জন্যে তিনি গল্পের বক্তাকে অনুরোধ করেন , সেই গল্পে থাকবে বস্তির চিত্র , দুর্ভিক্ষের ছবি । অল ইন্ডিয়া মার্কেটের জন্যে এই সিনেমার হিন্দীভার্সাই করবেন তিনি । গল্প লেখার জন্যে যে পারিশ্রমিক দরকার তা দিতেও তাঁর আপত্তি নেই । নিত্যানন্দ চৌধুরীর

অন্ততঃ চরিত্রটিকে গল্পে এইভাবে দেখানো হয়েছে ।

'কানাই' গল্পে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের বাজারে রঞ্জনের বাড়ির পাচক কানাই হাত পেতে টাকা নেয় না ঠিকই, কিন্তু বাজার করার সুযোগ পেয়ে গোপনে জিনিসের দাম বেশী রেখে লাভ করে নেয় । রান্না করাটা তার একমাত্র পেশা ছিল না, তার বাইরে তার ছিল পিয়নের কাজ । রঞ্জনের বাড়িতে রান্নার কাজ করে তার পেট চলে যেত । বাইরে সততার ভান করলেও কানাই আসলে সৎ নয় । ভদ্রলোকের ছেলে বলে সে হাত পেতে পয়সা নেয় না । অন্যদিকে মুরারী ডাক্তার রঞ্জনের সহপাঠী, ছেলেবেলা থেকে তাঁর ধর্মে মতি । অথচ তিনি রঞ্জনের স্ত্রী অণুর জন্যে ম্যালেরিয়ার কুইনাইন পাশের ঘর থেকে এনে দিয়েছেন বলে ডবল দাম নেন । কানাই এবং মুরারী ডাক্তার দুজনের অধিষ্ঠান সমাজের দুপ্রান্তে । কিন্তু যে কারণে পরমধার্মিক মুরারী টাকায় চারটে কুইনাইনের ব্যবস্থা করে থাকেন, ঠিক সেই কারণেই পনের সের কয়লাকে কানাই আধ মন বলে চালায় । এদিক থেকে দুজনের চরিত্রই সমগোত্রীয় । চরিত্রপ্রধান গল্প হিসাবে গল্পটির মূল্য কম নয় ।

ভাবপ্রধান গল্পে কাহিনীর বিস্তার বড়ো কথা নয়, একটি মুহূর্ত, একটি চিন্তা, একটি অনুভবই গল্পের উপকরণ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট । এই শ্রেণীর গল্পে কোনো ঘটনা তৈরী না হলেও মানব জীবনের সুখ, দুঃখ, অভাব, আশা আনন্দের রেখাচিত্র ফুটে ওঠে । ভাবপ্রকাশই এখানে বড় কথা । গল্পগুলি ব্যঞ্জনাধর্মী, ইঙ্গিতমুলক । গল্পের প্রথম থেকে সমাপ্তি অবধি একটি মাত্র ভাব এতে কবিতার সুরের মতো বাজতে থাকে । ভাবপ্রধান গল্পে একটি মুহূর্ত, একটি মনন, একটুখানি দেখা, একটি মেজাজ গল্পের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে । ঘটনা পরিহার করে একটি বিশেষ ভাব বা mood কে ফুটিয়ে তুলে গল্পের মধ্যে মহামুহূর্তটি এনে দিলেই এই ধরণের গল্পের শিল্প সার্থকতা । ভাবপ্রধান গল্পে ঘটনার গুরুত্ব বা নরনারীর সংখ্যা যতদূর সম্ভব কম ।

রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার, একরাত্রি, সুভা এই ধরণের গল্প। ঘটনা থাকলেও তা খুবই সামান্য। ভাবপ্রধান গল্প –" কোনো অনুভূতি, উপলব্ধি বা আবেগকে প্রকাশ করে – এই জাতীয় রচনাতেই দার্শনিকতা ও কাব্যধর্মিতার অঙ্কুর নিহিত থাকে।" [৪১] বাচ্যার্থ থেকে ব্যঞ্জনার্থে পৌঁছে দেওয়াই এ জাতীয় গল্পের সার্থকতা। কোনো সুস্পষ্ট ঘটনা কিংবা নাটকীয় পরিসমাপ্তি না থাকলেও এ ধরণের গল্প অপূর্ব আস্বাদনীয় হয়ে ওঠে।

'সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে' গল্পে ঘটনা বিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ মুখ্য প্রতিপাদ্য নয়। গল্পের প্রথম থেকে শেষ অবধি এক আশ্চর্য ভাব পরিমণ্ডল গল্পটিকে ভাবপ্রধান গল্পে পরিণত করেছে। এ গল্পের নায়ক অংশু একদিন পিকনিক করতে এসেছিল খড়দাতে। সেখানে তার বাবার অফিসের কর্মচারী মন্মথবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে যায়। মন্মথবাবুই তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে হিমানীর হাতের চা আর গানে মুগ্ধ হয়ে যায় অংশু। তাই কলকাতায় ফিরে গিয়েও কেবলই তার মনে হয়েছে –'তোমার মত এমনটানে কেউ তো টানে না।' এই টানেই দু'বছর বাদে তাদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন হল। রেজিস্ট্রেশনের পর যখন দুজনে নতুন জীবনের স্বপ্ন বিভোর হওয়ার কথা, তখনই এসেছে বাধা। কিন্তু সে বাধা তাদের দুজনেরই মনের। অংশুর মনে হয়েছে – তার মেজাজী বনেদী বাবা হয়তো এ বিয়ে সইতে পারবেন না। হিমানী ভাবে-তার বাবা চাকরী চলে যাবার ভয়ে এ বিয়েতে মত দেবেন না। একরাতের জন্য অংশু চেয়েছিল কোনো হোটেলে তাদের প্রথম বাসর রাত কাটাতে। কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বজড়িত মন নিয়ে হোটেলে বাসর রাত কাটানো আর হল না তাদের। আসলে বিয়ের পূর্বে সাতদিন ধরে যে দুঃসাহসের আলো তাদেরকে রোমান্টিক উজ্জলতায় ভরে রেখেছিল, বিয়ের পরে তাতে নেমে এসেছিল সারি সারি ছায়া। শেষ পর্যন্ত

---

৪১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যে ছোটগল্প, শ্রাবণ, ১৩৮৪, ৫ম সংস্করণ, ডি.এম.লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা - ৩১২

হিমানীকে বাড়ি ফেরার জন্যে নৈহাটী লোকাল ট্রেনে তুলে দিয়ে অংশু বাড়ি ফিরে আসে। আসলে যে ভয়ে তারা কাতর হয়েছিল, সে ভয় অংশুর কিংবা হিমানীর বাবাকে নয়, চারিদিকের কম শানিত চক্ষু এই পৃথিবীকেও নয়। তাদের দুজনের মধ্যেই এই ভয় ছিল সীমাবদ্ধ।" অসংখ্য মানুষ আর অনেক বাধার ভেতর দিয়ে দুজনে দুজনকে কিছু দেখেছে, কিছু দেখতে পায়নি। আর সেই না দেখাটুকু ঘিরে স্বপ্ন ঘনিয়েছে, জড়িয়েছে মোহের জাল। কিন্তু আজকে সমস্ত আড়াল সরিয়ে দিয়ে দুজনে যখন একান্ত হয়ে দাঁড়ালো, যখন কোথাও কোনো আবরণ রইল না, তখনই তো যাচাই করবার পালা। তোমার আমার সেই সম্পূর্ণতা – যার ওপর কোনো কুয়াশা নেই – কোথাও আলো আঁধারি নেই – সেই সম্পূর্ণ নগ্নতাকে তুমি আমি কি স্বীকার করতে পারব, সইতে পারব, মমতায় প্রেমে ধন্য করে নিতে পারব? পারব দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর?"[৪২] এই মধ্যযুগত দুর্বলতা নিয়ে ট্রেনে থেকে নেমে রিক্সায় যেতে যেতে অন্তঃসারশূন্য বিবাহিত জীবনের কথা ভাবতে ভাবতেই অংশুর হাতের টেনে দেওয়া সীঁথির সিঁদুরের রেখা ঘষে তুলে নিতে থাকে হিমানী। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্কের স্নায়ুতে একটা চাপা যন্ত্রণার ক্ষীণ বিদ্যুৎ ছড়িয়ে যায়। পরিবার পরিজনের বাধা গল্পে দুজনের মিলনের বাধা হয়ে ওঠেনি, নায়ক - নায়িকার অন্তর্গত দুর্বলতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, লোকলজ্জা ও অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তা নায়ক নায়িকার রোমান্টিক প্রেমের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। ভাবপ্রধান গল্প হিসেবে তাই গল্পটি ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে।

'জীবানু' গল্পে সারদাপ্রসাদের জীবনে একদিন স্বপ্ন ছিল, রোমান্স ছিল। ডাক্তারীর শেষ ডিগ্রী নিয়ে লণ্ডন থেকে কলকাতায় ফিরে প্র্যাকটিস আর ল্যাবরেটরী নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্থায়ীকীর্তি স্থাপন করে যাবেন সারদা প্রসাদ – এই ছিল তার স্বপ্ন। লণ্ডনে থাকার সময়েই তাঁর জীবনে দুরন্ত মৌসুমী বায়ুর মতো

---

৪২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -১০ (গল্প -সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে), জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, (১ম প্রকাশ), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা -২৭১

আবির্ভাব ঘটেছিল গ্ল্যাডিস থার্স্টন নামে একটি মেয়ের । সারদাপ্রসাদ তার চোখে দেখেছিলেন সমুদ্রপারের নীলিমা, দেহবর্ণে দেখেছিলেন আল্পসের তুষার । কিন্তু পড়াশুনা আর প্রচণ্ড পরিশ্রমে যখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল তখন গ্ল্যাডিসের তাগিদেই স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে তিনি গেলেন সুইজারল্যাণ্ড । সেখানে কয়েকদিনের মধ্যে সারদা প্রসাদ সুস্থ হয়ে উঠলেও তাঁর ঘাড়ের নিচে মেরুদণ্ডে দেখা দিল টিউবার কুলোসিস । ডাক্তার তাঁকে চিকিৎসা করে সুস্থ করলেন, কিন্তু কাঁধ থেকে গলার মাঝামাঝি অনেকটা জায়গার হাড় কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে । ফলে সারদাপ্রসাদ হলেন পঙ্গু । পরীক্ষা, প্র্যাকটিস আর ল্যাবরেটরীর স্বপ্ন গেল হারিয়ে । ইংলিশ চ্যানেলের নীল জলে হারিয়ে গেল গ্ল্যাডিসের নীল চোখ দুটি । তবু সারদা প্রসাদ বেঁচে রইলেন । মুখের সামনে স্ট্রীয়ের আয়নায় চারিদিকের দৃশ্য ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন তিনি । তাই আত্মীয় পরিজন আর মানবিক প্রেমের পরিধিতি থেকে দূরে পাহাড়ী বাংলোয় এসে আশ্রয় নিয়েছেন সারদাপ্রসাদ । পাহাড়ী ঝর্ণা, বৃষ্টি, ফল, দেওদারের, মর্মরতার মাঝে খবরের কাগজ আর মেডিক্যাল জার্ণালের পাতায় সারদা প্রসাদ খুঁজে বেড়ান এমন এক আবিষ্কারের কথা যা তাঁর জীবনের পঙ্গুত্বের অবসান ঘটাবে । কিন্তু সারদা প্রসাদের জীবনে সেই সুযোগ আর ধরা দেয়নি । সুস্থ স্বাভাবিক জীবন নিয়ে সারদা প্রসাদ জীবনে চেয়েছিলেন দুরন্ত যৌবনকে, কিন্তু তাঁর জীবনে সেই ইচ্ছা আর পূর্ণ হতে পারেনি । তাই যৌবনকে তিনি বড় ভয় করেন । এই কারণেই তাঁর বাংলোর বারান্দায় বৃষ্টি ভেজা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পাহাড়ী দম্পতি এসে ক্ষণিকের জন্য আশ্রয় নিলেও তিনি চাকরকে ডেকে তাদের তাড়িয়ে দিলেন, এমনকি ফিনাইল ছিটিয়ে, নাইজল স্প্রে করে দিতে বললেন । সারদা প্রসাদ জীবাণুকে ভয় করেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভয় করেন পাহাড়ী দম্পতির পাথুরে শরীরের শিরায়-শিরায়, রক্তে-রক্তে প্রবাহিত যৌবনকে । যৌবন ব্যর্থ সারদা প্রসাদের অন্তরের হাহাকার গল্পে অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে ট্র্যাজিক পরিবেশ রচনা করেছে । তাই এ গল্পকে ভাবপ্রধান গল্পবলা চলে । তাছাড়া চরিত্রের সমাবেশ এ গল্পে নেই বললেই চলে । সারদা প্রসাদের জীবনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে ।

জঙ্গলী, ল্যাবরেটরী, প্রেমিকা সব তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। তাই অসহায় আর্ত সারদা প্রসাদের পঙ্গু জীবনের হাহাকার, জীবনে সুস্থতা পাওয়ার জন্যে সুতীব্র আকুতি, নীলনয়না প্রেমিকা গ্লাডিসের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ এবং যৌবনের ব্যর্থতায় পাহাড়ী দম্পতির প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা — এ সবের মধ্য দিয়ে সারদা প্রসাদের অন্তর বেদনার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং ভাবপ্রধান গল্প হিসাবে এগল্প সার্থক।

'বনতুলসী' গল্পে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের আশ্চর্য সুন্দর প্রকৃতি, রাঙামাটির টিলায় তাল বীথির মর্মরতা, ধুলোর কুয়াশা ছড়িয়ে চলা গোরুর গাড়ির যাতায়াত, ভুট্টার ক্ষেত, টেলিগ্রাফের তারে ফিঙে আর বুনো টিয়ার ঝাঁক, উপবনে বহুবর্ণের প্রজাপতি, খোলা আকাশের নীচে সোনালি রোদ, আর নদী তীরের বনতুলসীর ঝাড় সবই আশ্চর্য ভাববিহ্বলতার সৃষ্টি করেছে। এ গল্পে বনতুলসী আর মানবীয় প্রেম এক ও অভিন্ন হয়ে উঠেছে। বনতুলসীর আরণ্য গন্ধ বিভোর স্বপ্নে একদিন গল্পের নায়ক বনতুলসীর প্রেমে পড়েছিলেন। বনতুলসীর বনেই তুরী বালিকার উপস্থিতিতে তার জীবনে মানবীয় প্রেমের আবির্ভাব হয়েছিল। পরবর্তীতেও শিকারে এসে বনতুলসীর জঙ্গলে পূর্ণযৌবনা বিবসনা সাঁওতাল মেয়ের আবির্ভাবে সেই একই পরিবেশে বনতুলসীর বন্য প্রেমের আকর্ষণে আদিগন্তহীন বনতুলসীর ঝাড়ে পথ হারিয়ে নায়ক অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকেন। মানুষের প্রেমের মতো প্রকৃতির প্রেমও যে সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে — আশ্চর্য সুন্দর ভাবপ্রবণতার মধ্যদিয়ে তা গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং গল্পটি ভাবপ্রধান।

'রেকর্ড' গল্পটিতে কলকাতার চোরাবাজার থেকে সংগ্রহ করে আনা পুরনো রেকর্ডের গানের ভাষা বোঝা প্রথমত সম্ভব না হলেও শেষ পর্যন্ত এক ভূপর্যটক এসে বলেন —" ন্যাৎসী অধিকারের সময় এই রেকর্ডটি ছিল দোকানদার

মুক্তি যোদ্ধাদের গান। হিটলারের গোয়েন্দারা দাবি করেছিল এর প্রতিটি কপি, আর অরিজিনাল – এর প্রত্যেকটি শিল্পীকে তারা লিকুইডেট করেছে। অথচ সেই রেকর্ড পাওয়া গেল কলকাতার বাজারে।" [৪৩] রেকর্ডের গানটির ভাষা বিদেশী, দুর্বোধ্য হলেও এদেশের ব্রহ্মপুত্রের বর্ষা মাদল, নাগা পাহাড়ের ঢাক, ঘোনাচের বাজনা, নাগারা টিকারার আওয়াজ, মার্কাস স্কোয়ার থেকে ভেসে আসা বাঘের ডাক আর কলকাতার রাজপথে বিপ্লবীদের আগস্ট আন্দোলনের পুলিশের ঘা খাওয়া মিছিল – সব মিলে এক নিবিড় ঐকতান সৃষ্টি করেছে। স্বল্প পরিসরের মধ্য দিয়েও আশ্চর্য ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে গল্পটিতে। তাই রেকর্ড একটি সুন্দর ভাবপ্রধান গল্প।

'মশা' গল্পে অপূর্ব শান্তাকে নিয়ে চায়ের দোকানে বসে কোনজিকস্ খেতে খেতে মনে করেছিল – আসল কথাটি বলবে। কিন্তু অপূর্ব ও শান্তার দুঃসহ দারিদ্র্য, কলকাতার বিশ্রী গরম, মশার উপদ্রব, উভয়ের ছেঁড়া পোশাক – নিয়ে কথোপকথনের মধ্যে আসল কথাটি অপূর্ব শান্তাকে বলতে পারেনি। দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ায় মনোরম সন্ধ্যা, টবের বেলফুল, হেনারগন্ধ ছড়ানো বাগান, খোলা আকাশ তাদেরকেনতুন তরুর নিচে বসে গল্প করার সুযোগ এনে দিলেও কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের দুজনের মূল্যবান কথাটি না বলাই থেকে গেছে। ভাবপ্রধান গল্প হিসাবে এ গল্পের আবেদন সর্বাধিক।

'মধুবন্তী' গল্পে বারো বছর আগে যতীন কাকার মেয়ে জয়াকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা চিত্ত ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু বারো বছর পরে ইনসিয়োরেন্স

- -

৪৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -৮ (গল্প -রেকর্ড), ভাদ্র ১৩৯১, প্রথমপ্রকাশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ৩৭২

কোম্পানির এক পরিচিত ভদ্রলোকের নতুন বাড়িতে চায়ের সন্ধ্যায় দক্ষিণের খোলা বারান্দায় ফুলের সমারোহ, বসন্তের হাওয়াতে ঝাউয়ের পাতায় সমুদ্র কল্লোল ও সেতারের মধুবন্তী রাগ শুনে সাপ, বাঘ, বুনো শুয়োরের ভয়, বিল, জলা আর মাঠ পেরিয়ে বারো বছর আগে জয়াকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে চিত্ত এসে দাঁড়ায় যতীন কাকার বাড়িতে। কিন্তু জয়া ও যতীন কাকার ব্যবহারে চিত্ত কোন আন্তরিকতা খুঁজে পায়নি। তবে চিত্ত বিদায় নেবার সময় জয়া তাঁকে লন্ঠন ধরে খাল পার করে দিয়ে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। তখনই চিত্তর মনে হয়েছিল —" মাত্র এই মুহূর্তে জয়া কোমল, নমনীয় হয়ে উঠেছে, মাত্র এই মুহূর্তে আমি ওর হাতখানাকে আবার টেনে আনতে পারি মুঠোর ভেতরে বলতে পারি ... "[৪৪] কিন্তু চিত্ত মুহূর্তটিকে কাজে লাগাতে পারেনি। কাছাকাছি কোথা থেকে ভেসে আসে কুকুরের ডাক, সেই ডাকেই তাদের মিলন মুহূর্তটি যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই জয়া অন্ধকার মাঠের মধ্যদিয়ে ফিরে চলে যায়। বারো বছর আগের প্রতিশ্রুতি রক্ষার চকিত সুযোগ হাতের মুঠোর ভেতরে পেয়েও চিত্ত তা রক্ষা করতে পারেনি। একটি বিশেষ মুহূর্তকে অপূর্বভাবে ফিরে পাবার আয়োজন আপনা থেকেই সম্ভব হয়ে উঠলেও তার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। চিত্ত জয়াকে কাছে পেলনা ঠিকই, কিন্তু দত্তসাহেবের দক্ষিণের খোলা বারান্দায় বসে সেতারের মধুবন্তী রাগ শুনে সে জয়ার কথাই ভাবতে পারবে — এই সান্ত্বনাই খুঁজে নিয়েছিল মনে মনে। ভাবপ্রধান গল্প হিসাবে এ গল্পের সার্থকতা অনেকই।

'পান্ডুলিপি'তে বিপত্নীক নিঃসন্তান তারাকান্ত তাঁর ভাইপো বিভূতিকে নিজেরই প্রতিকৃতিরূপে গড়তে চেয়েছিলেন। তাই প্রতিদিন কত নিত্যনতুন গল্প, দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী শুনিয়ে বিভূতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্যে তারাকান্ত

---

৪৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -১১(গল্প -মধুবন্তী), গোলপূর্ণিমা, ফাল্গুন, ১৩৯৪, প্রথম প্রকাশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ২২১

আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন । আব্রাহাম লিংকন, জর্জ ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনি মুসোলিনী, লড়ুর আর বিসমার্কের মতোই তাকে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তিনি । বিভূতি হবে ক্যানভাসের ওপর আঁকা তারাকান্তর নিজেরই প্রতিমূর্তি — অথবা তাঁরই আত্মজীবনী । ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতায় চলে আসার সময় তারাকান্ত বিভূতিকে বলেছিলেন - You must be a superman । বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সোনার মেডেল পেয়ে বিভূতি দেশে ফিরেছেন । কিন্তু স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার পর বিভূতির সঙ্গে বন্ধু ও হিতৈষীদের দেখে তারাকান্ত ভাবলেন, তাঁর বাঁধা ফর্মুলার বাইরে কোন স্বতন্ত্র সত্তা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে বিভূতির ভেতরে । হয়েছিলও তাই । ততদিনে বিভূতি একজন সুনামধন্য সাহিত্যিকে পরিণত। তারাকান্তর সৃষ্টে গড়া বিভূতিকে তখন আর পৃথক করে পাবার কোন উপায় ছিল না । তাই তারাকান্ত ভাবলেন —" তাঁর নিজস্ব পান্ডুলিপি আজ যে তাঁরই হাতের লেখাকে নিশ্চিহ্নভাবে মুছে দিয়ে ছাপার অক্ষরে সমস্ত পৃথিবীর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে মুক্ত হয়ে গেছে, এই কি তিনি চেয়েছিলেন ?—" ৪৫ ঘটনাদ্বন্দ্ব নয়, চারিত্রিক বিকাশও নয়, গল্পটির মধ্যে বিভূতিকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তি করে গড়ে তুলবার জন্য তারাকান্তর ঐকান্তিক প্রয়াস, ভাবোদ্দীপক শেষ পর্যন্ত অনেক নতুন সত্তা নিয়ে বিভূতির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে তারাকান্তর হৃদয়ের হাহাকারটিই প্রতিফলিত হয়েছে । ভাবপ্রধান গল্পের অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া আর এ গল্পকে অন্য কোন শ্রেণীতে চিহ্নিত করা সমীচীন নয় ।

'মদনভস্ম' গল্পে এক সপ্তাহ ধরে আয়োজন করে এক নির্জন সন্ধ্যায় জলের ওপর যখন পড়েছে তারার ছায়া, গাছের ফাঁকে যখন ঝুলে পড়েছে একফালি সপ্তমীর চাঁদ তখন একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এসে পাশাপাশি বসেছিল ।

---

৪৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী (গল্প -পান্ডুলিপি), মাঘ ১৩৬৮, ২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৪১১

তাদের জীবনে চিন্তা অনেক । তবু জীবনের সব চিন্তাকে ভুলবার জন্যেই এই ছায়া , এই সন্ধ্যা আর নির্জনতা ছিল তাদের কাম্য । কিন্তু এইটিই আশ্চর্যের যে তাদের বহু কষ্টে সংগৃহীত মিলনের মুহূর্তে দুজনে তাদের মনের কথাটি বলতে পারেনি । কারণে বাজে কথা বলার জন্যে ছেলেটির মন খারাপ , কোচিং ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার জন্যে অস্বস্তি , বি.টি. ও এম.এড্ পড়বার আকাঙ্ক্ষা এবং মেয়েটির পর্টস্থা-ড ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আসেশ , ছোট ভাইয়ের অসুস্থতার জন্যে উদ্বেগ — দৈনন্দিন জীবনের এই চিন্তা অভিজ্ঞতাগুলি আলোচনা করতে করতেই তাদের দুজনের আসল কথা বলা চাপা পড়ে যায় । অথচ সেই সুযোগেই তিনটি বেকার ছেলে এসে মিষ্টি কথা বলে তাদের দুজনের কাছ থেকে ঘড়ি , মনিব্যাগ নিয়ে চলে যায় । মূল্যবান সময়ের এই অপচয়ের জন্যে ফেরার পথে মেয়েটি ভাবে তিনজন গুণ্ডার এমনি করে আসাটাই যেন স্বাভাবিক । কারণ নতুন কথা , নতুন তারা , কবিতার লাইন আর গানের সুর খুঁজতে এসে নিরালা নির্জন সন্ধ্যার আয়োজন তারা মাটি করে দিয়েছে । দিবারাত্রির বহু সমস্যার ভিড়ে তাদের দুজনের মাঝখানের আধ হাত জায়গাও ফাঁকা থাকেনি । তাই উভয়ে এত কাছাকাছি বসেও তাদের অন্তরের কথাটি ব্যক্ত করতে পারেনি । কোন ঘটনা দ্বন্দ্ব বা চরিত্র বিশ্লেষণ এ গল্পেরবৈশিষ্ট্য নয় , গোটা গল্পেই আছে ভাবের সমাবেশ । কাজেই ভাব প্রধান গল্প হিসাবে এই গল্পকে বিচার করাই সঙ্গত ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলিকে আলোচিত বিষয়বস্তুর বিচারে পল্লীজীবনকেন্দ্রিক ও নগরজীবনকেন্দ্রিক গল্প হিসেবে শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে । বাংলাসাহিত্যে তাঁর পূর্বে অন্যান্য লেখকের গল্পে পল্লীজীবন কেন্দ্রিক গল্প সার্থকতা লাভ করেছিল । রবীন্দ্রনাথ , শরৎচন্দ্র , তারাশঙ্কর , বিভূতিভূষণ , মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় , মনোজ বসু প্রমুখ লেখকবৃন্দের গল্পে পল্লীজীবনের রূপ চিত্রিত হয়েছে । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পেও তেমনি বাংলার পল্লীজীবনের চিত্র

কলতান ধ্বনিত হয়েছে । আবার প্রেমেন্দ্র মিত্র , অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত , বুদ্ধদেব বসুর মতো তাঁর অনেক গল্পের পটভূমি নাগরিক জীবন । নিম্নে তাঁর ছোটগল্পগুলিকে পল্লীজীবনকেন্দ্রিক ও নগরজীবনকেন্দ্রিক এই দু'ভাগে শ্রেণী বিভক্ত করে গল্পগুলির বিশিষ্টতা নিরূপণ করা হল ।

গল্পের নাম	কোন্ শ্রেণীর ?
নীলা	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
তৃণ	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
নিশাচর	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ষাঁড়	নগরজীবনকেন্দ্রিক
সৈনিক	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
কবর	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
তীর্থযাত্রা	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
ছলনাময়ী	নগরজীবনকেন্দ্রিক
নুচির উপাখ্যান	নগরজীবনকেন্দ্রিক
আত্মহত্যা	নগরজীবনকেন্দ্রিক
নক্রচরিত	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
দুঃশাসন	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
বালোজন	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
পুষ্করা	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক

গল্পের নাম	কোন্ শ্রেণীর ?
একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকা	নগরজীবনকেন্দ্রিক
দর্পণ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
বাইচ	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
গোখরো	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
প্রপাত	নগরজীবনকেন্দ্রিক
অনেকবেশী আকাশ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
দেনা	নগরজীবনকেন্দ্রিক
অভিনয়	নগরজীবনকেন্দ্রিক
গোত্র	নগরজীবনকেন্দ্রিক
পলায়ন	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ইন্টারভিউ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
হার্মাদের একরাত	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
ভাটিয়ানী	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
ছায়াসঙ্গিনী	নগরজীবনকেন্দ্রিক
নীলকণ্ঠ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
অন্ত্যেষ্টি	নগরজীবনকেন্দ্রিক
বাড়িবদল	নগরজীবনকেন্দ্রিক
করাত	নগরজীবনকেন্দ্রিক
নকল	নগরজীবনকেন্দ্রিক

গল্পের নাম	কোন্ শ্রেণীর ?
স্নিহ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
চায়ের বিকেল	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ব্লুড	নগরজীবনকেন্দ্রিক
পদধ্বনি	নগরজীবনকেন্দ্রিক
অনুকল্প	নগরজীবনকেন্দ্রিক
চাবি	নগরজীবনকেন্দ্রিক
সুধা আসবে	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
প্রহরী	নগরজীবনকেন্দ্রিক
প্রভাত	নগরজীবনকেন্দ্রিক
আকাশ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
প্রতিপক্ষ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
একজিবিশন	নগরজীবনকেন্দ্রিক
অমনোনীতা	নগরজীবনকেন্দ্রিক
তিনটি	নগরজীবনকেন্দ্রিক
আতিথ্য	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
মধ্যবর্তী	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
গলি	নগরজীবনকেন্দ্রিক
চতুর্থকোণ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
আমার কথা	নগরজীবনকেন্দ্রিক

গল্পের নাম	কোন্ শ্রেণীর ?
কাদা	নগরজীবন কেন্দ্রিক
এক জঙ্গল থেকে	পল্লীজীবন কেন্দ্রিক
মুকুন্দর পাত্রী	নগরজীবন কেন্দ্রিক
কে সে লোকটা	পল্লীজীবন কেন্দ্রিক
প্রকম্পন	নগরজীবন কেন্দ্রিক
দোলনচাঁপার বৃন্ত	নগরজীবন কেন্দ্রিক
ক্যারিক্টোর	নগরজীবন কেন্দ্রিক
মিছিলের মধ্যে	পল্লীজীবন কেন্দ্রিক
ছোরা	নগরজীবন কেন্দ্রিক
ফিউজ	নগরজীবন কেন্দ্রিক
প্রকলঙ্ক	নগরজীবন কেন্দ্রিক
সিদ্ধিলাভ	নগরজীবন কেন্দ্রিক
মদনভস্ম	নগরজীবন কেন্দ্রিক
নদীর পা	পল্লীজীবন কেন্দ্রিক
দ্যুত	নগরজীবন কেন্দ্রিক
কমিশন	নগরজীবন কেন্দ্রিক
যাচাই	নগরজীবন কেন্দ্রিক
গাছের সারি	নগরজীবন কেন্দ্রিক
মোমিনের কাল	নগরজীবন কেন্দ্রিক

গল্পের নাম	কোন্ শ্রেণীর ?
মাধ্যাকর্ষণ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
আরো একজন	নগরজীবনকেন্দ্রিক
আলেয়ার রাত	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
টুটুন	নগরজীবনকেন্দ্রিক
আসানসোলের লোকটা	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ভাঙা চশমা	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
বনবিড়াল	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
খড়গ	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
মধি	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
ডিম	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
পাইপ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ভোগবতী	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
বনতুলসী	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
জীবাণু	নগরজীবনকেন্দ্রিক
চারতলা	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ডিনার	নগরজীবনকেন্দ্রিক
প্র্যাকটিস	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
ধন্বন্তরি	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
পিতরি	নগরজীবনকেন্দ্রিক

গল্পের নাম	কোন্ শ্রেণীর ?
তরফদার	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
একটি শত্রুর কাহিনী	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
ইতিহাস	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
বনজ্যোৎস্না	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
হয়তো	নগরজীবনকেন্দ্রিক
সেই মৃত্যুটা	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
দোসর	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
বিসর্জন	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
কালোজিন	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
কলপুরুষ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
শৈব্যা	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ইজ্জৎ	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
অপঘাত	নগরজীবনকেন্দ্রিক
বন্দুক	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
শিল্পী	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
*শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু	নগরজীবনকেন্দ্রিক
উস্তাদ মেহেরা খাঁ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
কালাবদর	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক

গল্পের নাম	কোন্ শ্রেণীর ?
বাইশে শ্রাবণ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ধর্ম	নগরজীবনকেন্দ্রিক
তিমিরাভিসার	নগরজীবনকেন্দ্রিক
অধিকার	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
জ-মড বৃষিক	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
শ্বেতকমল	নগরজীবনকেন্দ্রিক
হাত	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ঘাসবন	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
রিবন বাঁধা জুনক	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
কেয়া	নগরজীবনকেন্দ্রিক
মধুগর	নগরজীবনকেন্দ্রিক
উদ্বোধন	নগরজীবনকেন্দ্রিক
উত্তরপুরুষ	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
তিনকাঁধা	নগরজীবনকেন্দ্রিক
মহলা	নগরজীবনকেন্দ্রিক
একটি চিঠি	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
রেকর্ড	নগরজীবনকেন্দ্রিক
তিতির	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
পুষ্পণ	নগরজীবনকেন্দ্রিক

গল্পের নাম	কোন্ শ্রেণীর ?
ধুম	নগরজীবনকেন্দ্রিক
কল্পপুরুষ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
লজ্জা	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ইদু মিঞার মোরগ	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
গন্ধরাজ	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
নতুন গান	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
কলঙ্ক	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ঘাস	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
পুরোনো	নগরজীবনকেন্দ্রিক
দণ্ডিত	নগরজীবনকেন্দ্রিক
একটি অমর রাত্রি	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
প্রতিনায়ক	নগরজীবনকেন্দ্রিক
দায়মোচন	নগরজীবনকেন্দ্রিক
মর্যাদা	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ভালো মোটর	নগরজীবনকেন্দ্রিক
নেতার জন্ম	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
লাল ঘোড়া	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
তপস্বিনী	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে	নগরজীবনকেন্দ্রিক

গল্পের নাম	কোন্ শ্রেণীর ?
হলদে চিঠি	নগরজীবনকেন্দ্রিক
সুখ	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
টাইফিওয়ালা	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ঘূর্ণি	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
ধাত্রী	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
সীমান্ত	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
যশ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
চক্রব্যূহ	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
বারো মরিকের বিল	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
বীরভোগ্য	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
মৃত্যুবাণ	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
আনুধলিয়ার শেষ খুন	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
আবাদ	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
সপ্তপদী	নগরজীবনকেন্দ্রিক
বৃষ্টি	নগরজীবনকেন্দ্রিক
জয়ন্তী	নগরজীবনকেন্দ্রিক
জন্মান্তর	নগরজীবনকেন্দ্রিক
বৃত্ত	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক
দুর্নম্য	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক

<u>গল্পের নাম</u>	<u>কোন্ শ্রেণীর ঃ</u>
বিভীষণ	নগরজীবনকেন্দ্রিক
ব্যাধি	পল্লীজীবনকেন্দ্রিক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অসংখ্য ছোটগল্পের পটভূমি বাংলার পল্লীজীবন। কিন্তু কেবলমাত্র এপার বাংলার কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের পল্লীজীবন তাঁর গল্পের পটভূমি হিসেবে ধরা পড়েনি। সারা বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের বিচিত্র জীবনযাত্রার পরিচয় আছে তাঁর গল্পে। সেই সূত্রে কখনো উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার গ্রাম, কখনো জলপাইগুড়ির পাহাড়ী নদী আর চা বাগান ঘেরা গ্রাম, মহানন্দা পারের পল্লীজীবন তাঁর গল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের নদী, নালা, বিল - জলা বেষ্টিত গ্রাম, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার গ্রামজীবন গল্পের পটভূমি হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

পল্লীজীবনকেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে 'প্রদীপ ও প্রজাপতি' গল্পে আড়িয়াল খাঁর তীরের গ্রাম ও তার জীবনযাত্রা গল্পের পটভূমি। একদিন এই গ্রাম ছিল সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। আড়িয়াল খাঁর কাছে খালের উপরে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে সোনা পিসীমার বাড়ি। সেখানে কাঁটাফুলের এলোমেলো জঙ্গল, সুপারি বাগান, ছায়াছন্ন গ্রামের কালো মাটির ভিজে পথ, ঘুঘুডাকা বাড়ি, পথের আশে পাশে ছড়ানো মঠ, চিতা, সব মিলে নিখুঁত এক পল্লীজীবনের চিত্র ধরা পড়েছে। শুধু তাই নয়, জরাজীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপ, বৈশাখী ঝড়ে উপড়ে যাওয়া নাটমন্দির, ফাটল ধরা দোলমঞ্চ আর সোনা পিসীমাদের এককালের অবস্থাপন্ন সংসারের বর্তমানে বিপর্যস্ত হওয়ার চিত্র গল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পল্লীবাংলার জীবনযাত্রাটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের ফল এসবের মধ্যে যেমন গ্রামের জীবনে সুখ আছে, শান্তি আছে তেমনি তারই পাশাপাশি শরিকী কোন্দল, চোরের উপদ্রব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে, গ্রামের জীবনে তিক্ততাও অনেক।

পাশাপাশি এ দুটি দিকই লেখক তুলে ধরেছেন । এই জন্যেই গল্পের সোনা পিসীমা যখন তাঁর জীবন সায়াহ্নে ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ আর বাগানের ফল - এসবের প্রতি মমতায় গ্রাম আঁকড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছেন তখন টুনু বৌদি সেই জীবনে কেবলই অসহায়তা অনুভব করে শহরে ছুটে যেতে ব্যাকুল হয়েছিলেন ।

'তূণ' গল্পে ধাওয়া পাড়ার মুসলমান জেলেদের বিপন্নজীবনের চিত্রই গল্পের উপজীব্য । বিলে মাছ নেই ।''চাল এক টাকা সের, নুনের দাম পাঁচ টাকা ও আট গণ্ডা পয়সা দিয়েও এক নাটিম জালের সুতো পাওয়া যায় না । বিলের মাছগুলো দিনের পর দিন ফুরিয়ে আসছে বিস্ময়কর ভাবে ।'' ৪৬ তদুপরি জমিদার মহাজনের অত্যাচার, হাসানপুরের জমিদারের অধীনে বেগার খাটা, তোলা ও নজরানা হিসেবে মাছ তুলে নিয়ে যাওয়া এমনকি ঘরের সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি জমিদারের লোভ সব মিলে দরিদ্র মানুষের গ্রাম্যজীবনের অসহায়তা গল্পের উপজীব্য । ধাওয়া পাড়ার বসির মাঝির উপর জমিদারের অত্যাচার, পাইকারের বিশ্বাসঘাতকতা ও বসিরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পল্লীজীবনে অত্যন্ত অসহায় মানুষের ক্রন্দনধ্বনিই গল্পে ট্র্যাজিক পরিবেশ রচনা করেছে । 'নীলা' গল্পেও বাংলার পল্লীর বিবর্ণ জীবন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । এই গ্রাম সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ । আমনের ধান আর আউশের ক্ষেতে বাংলার অনাবিল শরৎ, রেল লাইনের বাঁধ, ডোবায় ফুটে থাকা কলমী ফুল, শাদা - রাঙা শালুক, বাঁশবন, নীলকণ্ঠ পাখির পাখার সঙ্গে নীলকাশের মেশামেশির মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লীগ্রামের সৌন্দর্যকে তুলে ধরা হলেও তারই আড়ালে পচা ডোবা, জংলা, আমের বন, দারিদ্র্য আর অস্বাস্থ্যের ক্ষয়রোগ বাংলার চিরন্তন পল্লীর অসহায়তায় প্রতীক হয়ে উঠেছে ।

---

৪৬. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী ৯-৯ (গল্প-তূণ), অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮, ২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৫১৫

এছাড়া মন্বন্তর-করা বন্দ, ম্যালেরিয়ার মড়ক বিধ্বস্ত বাংলার পল্লীর বিপন্ন জীর্ণ চাষীদের প্রতি নীতাপজ্ঞ মুনাফাখোরদের দুর্ব্যবহার — সবমিলে বাংলার পল্লীজীবনযাত্রার এক বেদনাময় চিত্র গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। 'কবর' গল্পেও দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলা দেশের গ্রাম, মোড়ল ও মহাজনপতিদের দ্বারা নির্যাতিত মানুষের জীবন প্রকট হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা, ব্যাধি, মৃত্যু আর কবরের দৃশ্য দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলার গ্রামের ভয়াবহরূপটিও প্রত্যক্ষ গোচর হয়ে ওঠে। 'তীর্থযাত্রা' গল্পের পটভূমি পশ্চিমবাংলার গ্রাম। এ গ্রামে সুখ নেই, সমৃদ্ধি নেই, আছে কেবল অসহায়তা। চণ্ডীমণ্ডপে পূজো নেই, সাপ আর শেয়াল বাসা বেঁধেছে, বোধন তলায় নরমুণ্ডের ছড়াছড়ি।" বাংলার ঘরে ঘরে মঙ্গল প্রদীপের শিখা নিবে গেছে, ছায়াকুঞ্জের নিচে সোনার পল্লীতে কল্যাণীবধূর কাঁকন আজ আর ছন্দ ভরে বেজে ওঠে না। ব্ল্যাক আউটের নির্দেশে নিবে যাওয়া তুলসী তলার প্রদীপ সহস্র ছটায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে মহানগরীর গণিকাপল্লীতে।"[৪৭] এই গ্রামেরই অর্থ পিশাচ নরোত্তম ঠাকুর যাজন যজনের পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে গাঁয়ের নৌকোয় তেরো থেকে ত্রিশ বছরের মেয়েদের কালীঘাটে নিয়ে যাওয়ার নাম করে বিক্রী করতে নিয়ে যাচ্ছিল শহরে। ফসলে ভরা গ্রাম সেদিন শ্মশান বাংলায় পরিণত হয়েছিল। বাংলার গ্রামে গ্রামে নিঃস্ব রিক্ত মানুষের দীর্ঘশ্বাস যেন অভিশপ্ত জীবন রচনা করে গেছে।

'নক্রচরিত' গল্পের নিশিকর্মকার গ্রামেরই মানুষ। মুখে বৈষ্ণবের আদর্শ আওড়ালেও একজন লোভী স্বার্থপর মানুষ হিসেবেই তারপরিচয়। দুর্ভিক্ষ বাংলার গ্রামের মানুষ যখন না খেতে পেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মরে তখনও গ্রামের ইউনিয়ানবোর্ডের প্রেসিডেন্ট নিশিকর্মকারের চালের গুদামে মজুত থাকে চালের পাহাড়। তার অর্থলোলুপতার মধ্য দিয়ে তৎকালীন পল্লীবাসী মহাজনের

---

৪৭. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী - ৮(গল্প -তীর্থযাত্রা), মাঘ ১৩৮৮, ২য় মুদ্রণ
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ৩৭৬

চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত। আসলে নিশি কর্মকারের মত বকধার্মিক, অর্থ পিশাচ, সমাজবিরোধী মানুষই সেদিনের বাংলাদেশের গ্রামকে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাংলাকে মৃত্যুশয্যায় পরিণত করেছিল। 'মন্ত্রচরিত' একটি সার্থক পল্লীজীবন-কেন্দ্রিক গল্প।

'দুঃশাসন' গল্পেও বস্ত্র সংকটের আঘাতে দুর্দশাগ্রস্ত বাংলার পল্লীগ্রামের মানুষের অসহায়তার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। এ গল্পে একশ্রেণীর অসাধু বস্ত্র ব্যবসায়ীর গুদামে জমা থাকে কাপড়ের পাহাড়, কিন্তু আরেক শ্রেণীর গ্রামের দরিদ্র মানুষ লজ্জা নিবারণের বস্ত্র পায় না। অথচ থানার দারোগা আয়োজিত যাত্রার আসরে জীর্ণ, শীর্ণ, চক্ষু কোটরাগত দরিদ্র মানুষগুলোর সাথে বস্ত্র ব্যবসায়ী দেবীদাস ও তার ভাইপো দেখে দুঃশাসনের রক্তপান পালা। গ্রামের ঘর থেকেই শেয়ালে টেনে নিয়ে যায় সদ্যজন্মপ্রাপ্ত শিশুকে এবং মুচি পাড়ার ঘাটে বিবস্ত্রা কিশোরী ভোরবেলায় জল নিতে এসে মানুষ দেখে আড়ালে লুকায় – এই সব দৃশ্য গ্রামবাংলার দুর্দশাগ্রস্ত জীবনটিকেই পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলেছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মধুগাঁয়ের মানুষের মর্মান্তিক পরিণতির কথা তুলে ধরা হয়েছে 'কালোজল' গল্পে। প্রবাসী তারাপদ বহু আকাঙ্খা নিয়ে বাড়ি ফিরে আপনজন কাউকে পায়নি। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে, মেয়ে হয়েছে নিরুদ্দেশ। এ গল্পের গ্রাম মধুগাঁ, নদী আড়িয়াল খাঁ আর মাঝি শীতল দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার গ্রামের নীরবদর্শক। মন্বন্তর বাংলাদেশের গ্রামজীবনের ছবিটিই যেন বেদনার তুলিতে এ গল্পে আঁকা হয়েছে।

'ইজ্জৎ' গল্পে গ্রামের হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা, খলাম-ভাই - জগন্নাথ ঠাকুরের বিরোধ শেষ পর্যন্ত কাপড়ের আড়তদার ফটিকমিটির মেয়ের হাবিব মিঞার নানবিবির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মিটে গেছে। সমধর্ম ছেড়ে মন্তাই ও জগন্নাথ দু'জনে নানবিবির কাফনের কাপড় খবর খুঁজে বের করছিল। দুঃশাসন গল্পের মতো এ গল্পেরও মূল সমস্যা গ্রামের মানুষের ভয়াবহ বস্ত্রসংকট।

পুষ্করা' গল্পের পটভূমিকাও বাংলার গ্রাম। কলেরার মড়ক, মহামারী আর দুর্ভিক্ষের কবল থেকে ঘোষপুর গ্রামকে রক্ষা করার জন্যে সম্পন্ন মহাজন বলাই ঘোষ শহর থেকে পণ্ডিত তর্করত্নকে আনিয়ে শ্মশানকালীর পুজো দিয়েছেন। আসলে দুর্ভিক্ষের দিনে অলৌকিক বিশ্বাসে অন্ধ গ্রামের মানুষকে সন্তুষ্ট করে গোপনে ধানচালের ব্যবসা করে স্ফীত হয়ে ওঠার ব্যাপারটি চাপা দেওয়ার জন্যেই বলাই ঘোষ এই পুজোর আয়োজন করেছিলেন। সংস্কারান্ধ বাংলার পল্লীজীবনের এ এক নিখুঁত বাস্তব চিত্র।

এ ছাড়া 'চক্রবৃদ্ধি' গল্পের সোনাডাঙার বাঞ্ছাহাড়ি, নিস্তারণ লোহার, 'বারো মল্লিকের বিলে' সংস্কারান্ধ গঙ্গাধর, নব্য শিক্ষিত নীলমাধব, 'মৃত্যুবাণে'র অভিরাম গুনিন, 'আবাদ' গল্পের পরাণ ও জুড়ান মণ্ডল বাংলার পল্লীরই মানুষ। 'বাইচ' গল্পের নীল বাইচ, 'ভাটিয়ালী' গল্পের মা, অশোক ও সুধা, 'কালাবদরে'র মাঝি কফিলদ্দি, 'সীমান্ত' গল্পের ফজলে রব্বি, 'আলুথলিয়ার শেষ খুন' গল্পে আলুথলিয়ার পরিবর্তিত নিভৃত গ্রাম জীবন, বালিকা রামদুলারীর সাথে তার স্নেহের সম্পর্ক সবই বাংলার পল্লীজীবনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। তাছাড়া 'ভাটিয়ালী' গল্পের মায়ের পিঠে কাটা, দূরের নদী থেকে ভেসে আসা ভাটিয়ালী গানের সুর, 'মধুবন্তী' গল্পের পল্লী মেয়ে জয়ার কাছে শহরবাসী চিত্তর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থতা, 'তমস্বিনী' গল্পের পারুল কাকিমার জীবনের বিপর্যয়, 'খড়্গ' গল্পের কেতু, মুচি নীলাই, 'ধন্বন্তরি'র ডাক্তার খগেন দাস, কম্পাউণ্ডার সবই পল্লীজীবন কেন্দ্রিক গল্প রচনার উপকরণ ও চরিত্র হিসেবে গ্রাম বাংলার জীবন থেকেই আহরিত হয়েছে। এই কারণেই পল্লীজীবনের সার্থক রূপকার হিসেবে ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোট গল্পগুলি গভীর তাৎপর্যবহন করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক গল্পে নাগরিক জীবনের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। কলকাতার নগরজীবনেরই অধিবাসী ছিলেন তিনি। দিনাজপুর, ফরিদপুর ও বরিশালে তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অনেকদিন অতিবাহিত হয়েছে, তার প্রভাব গল্পেও আছে। নগর কলকাতার সাথে তাঁর বন্ধন পরবর্তীকালে দৃঢ় হয়েছিল বিশেষতঃ উত্তর কলকাতাকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। উত্তর কলকাতাতেই তিনি জীবনের অধিককাল অতিবাহিত করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি দক্ষিণ কলকাতার নিজ বাসভবনে লেকপার্কে (পঞ্চানন তলায়) এসেছিলেন। এই কারণে তাঁর গল্পগুলিতে বাংলার পল্লীজীবনের বিচিত্র কলতান ধ্বনিত হলেও পরবর্তীকালে অধিকাংশ গল্পই তিনি লিখেছেন নগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে। নগর কলকাতার বিচিত্র জনজীবনের পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর গল্পে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়' গল্পের পটভূমি কলকাতা। রাসবিহারী এ্যাভিনিউর পাশে আভিজাত্যগর্বিত প্রাসাদে রায়বাহাদুর এইচ. এল চ্যাটার্জীর বিলাসীজীবন ও মনোহরপুকুর পার্কের ভেসে আসা বুভুক্ষু মানুষের চিৎকারের মধ্য দিয়ে কলকাতার সুন্দর নাগরিক জীবনযাত্রার আড়ালে যে ভয়াবহজীবনযন্ত্রণা লুকিয়ে আছে - সেই পরিচয়ই এই গল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নগর কলকাতার জীবন কোনো সুখের জীবন নয়, এজীবনে বহু যন্ত্রণা ও বিপর্যয়। 'প্রদীপ ও প্রজাপতি' গল্পটির সূত্রপাত পল্লীজীবন দিয়ে হলেও গল্পের অন্তর্গত নাগরিক জীবনের যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তাতে এতটুকু সুখের স্পর্শ ছিল না। বাংলাদেশের গ্রাম ছেড়ে টুনু বৌদি বঙ্কুদার সাথে থাকবার জন্যে কলকাতায় চলে আসেন। কিন্তু সেখানে তাদের ভাগ্যে এসেছিল দুঃসহ বিপর্যয়। বঙ্কুদা চাকরী হারান, তাঁদের একমাত্র ছেলে রক্ত আমাশায় ভুগে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। টুনু বৌদি নিজে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ওষুধ পাননি। কলকাতার হরিহর দাস বাই লেনের বদ্ধ নোংরা পরিবেশে চুন সুরকি খসা ভাড়া বাড়িতে বাড়িওলির তাচ্ছিল্যকর ব্যবহারে টুনু বৌদির নাগরিক

জীবনযাপনের স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যায় ।'নিশাচর' গল্পের পটভূমিও কলকাতা । যুদ্ধ ও ব্ল্যাক আউটের দিনে দুঃস্থ এবং রিক্তশ্রী পটভূমিতে সমগ্র কলকাতার মানুষ যেন একাকার । রাত্রির কলকাতায় ভিক্ষুক , ভবঘুরে , চোর , বারবণিতা , গুণ্ডা ও কুলত্যাগিনীতে কোন পার্থক্য নেই । 'ছলনাময়ী'তে দক্ষিণ কলকাতার শ্মশানে ভণ্ডতান্ত্রিক ও সন্ন্যাসীদের স্বরূপ প্রকাশ করে সাধু ও সন্ন্যাসীদের চারিত্রিক শিথিলতাকে প্রকট করে তুলেছে । 'নুচির উপাখ্যানে' সিদ্ধেশ্বর বাবু কলকাতার মানুষ । যুদ্ধ - দুর্ভিক্ষের দিনে চালে কাঁকর মিশিয়ে তিনি লাখ লাখ টাকা কামিয়েছেন । কিন্তু তাঁর নিজের বাড়ির খাদ্যে কাঁকর থাকে না । 'চারতলা', 'ডিনার', 'পিতরি' গল্পের যথাক্রমে নিরঞ্জন চ্যাটার্জী রমাপতি ও সখানাথ কলকাতারই মানুষ ।'পিতরি'র বাবনতিনী বস্তির সখানাথ তার একমাত্র মেয়ে সত্যভামাকে একদিন বুড়ো হেডম্যানের হাতে গৌরী দান করে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল এবং পরবর্তীকে ভালো ছেলে ধীরেনের সাথে সত্যভামার বিয়ে দিতে সে কুণ্ঠিত হয়েছে । কারণ সখানাথের আশা ছিল - বুড়ো বয়সে সত্যভামাই তাকে খেতে দেবে । নগর কলকাতার একটি পরিবারের স্বার্থপর পিতার চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে সখানাথ একটি অদ্ভুত চরিত্র ।'বাইশে শ্রাবণ' গল্পটি কলকাতার দরিদ্র পরিবারের একটি ছাত্রীর আদর্শ কিভাবে বিনষ্ট হয়েছে তারই দৃষ্টান্ত ।'বাইশে শ্রাবণ' অনুষ্ঠান উদ্যাপনের পর শকুন্তলা অনুষ্ঠানের শেষে সভাপতিকে ট্যাক্সি ভাড়া দিতে গিয়ে দেখেছে - তার ব্যাগের কুড়ি টাকা নেই । নিরুপায় হয়ে শকুন্তলা বড় লোকের মেয়ে বেণু বোসের ব্যাগ থেকে গোপনে দুটো দশ টাকার নোট বের করে নিয়ে মান বাঁচিয়েছে । আসলে সে টাকা বাড়িতেই তার ভাই অজিত চুরি করে নিয়েছিল । এ গল্পের আদর্শ প্রাণ ছাত্রী শকুন্তলা , তার মা - মরা ভাইবোন , বাতের রোগে শয্যাশায়ীবৃদ্ধ বাবা , জুয়োখোর মাতাল দাদা , দুষ্টু ভাই অজিত আর তাদের বরানগরের একতলা ইঁটের করা বাড়ি নগর কলকাতার একটি দরিদ্র পরিবারের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের চিত্রটিই স্পষ্ট করে তোলে । 'তিমিরাভিসার' গল্পের ভাস্করের প্রণয়েশ যোষালি জয়াবতীর মেয়ে সুনীলাকে রক্ত

দান করে বাঁচিয়েছে, সুনীলা কৃতজ্ঞতায় প্রণবেশকে পেতে চেয়েছে, কিন্তু জয়াবতী প্রণবেশের মর্য্যাদা দেয়নি। অর্থোপার্জনের মোহ ছিল জয়াবতীর উদ্দেশ্য, কাজেই সুনীলা প্রণবেশকে জীবনসাথী করতে চাইলেও প্রণবেশ জয়াবতীর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। 'অপঘাত' গল্পেও নমিতা ও তার বাবা সত্যশরণবাবু কলকাতাবাসী। পুলিশ ইনস্পেকটার রঞ্জিৎ কলেজ স্কোয়ারের মিছিলে নৃত্যরতা নমিতাকে দেখে মনে করেছিল আদর্শপুরুষ। কিন্তু সত্যশরণবাবুর বাড়িতে এসে সে সত্যশরণবাবুর দুর্বল ও বিনয়ীমূর্তির মধ্যে দেখতে পেল আদর্শ বিসর্জনেরই রূপ। 'মশা' গল্পেও ফুটবল - রাজনীতি - সিনেমার তর্ক, ট্রাম - বাস মানুষের হুড়োহুড়িতে ভরা কলকাতায় অপূর্ব - শান্তার অভাবপীড়িত পারিবারিক জীবন, কলকাতার বিশ্রী গরম, মশা - এই নিয়ে এমন এক তিক্ত পরিবেশ বসবাস করে অপূর্ব ও শান্তা তাদের আসল কথাটি কোনোদিন বলতে পারেনি। নগর কলকাতার সমস্যাকন্টকিতজীবনে নায়ক নায়িকার প্রেম এইভাবেই শুকিয়ে যায়। 'কেয়া' গল্পে বেলেঘাটায় গ্রাম সুবাদে কাকার মেয়ে কেয়াকে পড়াতে গিয়ে অমৃত তাকে ভালোবাসে। কিন্তু একদিন যখন কেয়ার বাবাকে চুরির অপরাধে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তখন সে তার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে প্রাইভেটের ছাত্র রামপদর কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে কেয়ার বাবাকে জামিনে মুক্ত করে। কিন্তু শর্ত অনুযায়ী অপদার্থ রামপদর পরিবর্তে অমৃত পরীক্ষা দিতে এসে পরীক্ষকের হাতে ধরা পড়ে। তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার পর রামপদ অথবা কেয়া কেউই তার জামিন নিতে এগিয়ে আসেনি। স্বার্থপরতার এমন চরম দৃষ্টান্ত নগর কলকাতাকে আশ্রয় করেই প্রকাশিত হয়েছে এ গল্পে।

'সহচর' গল্পে শঠতা, প্রতারণার চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়েছে। এ গল্পের নামকরা জুয়াচোর মানব চক্রবর্তী তারাপদ দাস নামে নিজের পরিচয় গোপন করে এক নিরীহ স্কুল শিক্ষককে ঠকিয়ে তার দামী কলম ও ত্রিশ টাকা আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। 'মহলা', 'তিনসঙ্গী', 'সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে', 'হলদে চিঠি' প্রভৃতি গল্পেও নাগরিক জীবন নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'মহলা' গল্পে নাটকের নায়ক অভিমন্যু জয়ন্তীকে তার জীবনের নায়িকায় পরিণত করার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ভালো অভিনয় আদায় করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জয়ন্তীকে গ্রহন করেনি। জয়ন্তীকে সে জীবনের নায়িকা না করলেও এর পর থেকে জয়ন্তী এই মহলার গুণেই স্টেজ স্টার হতে পেরেছে। 'সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে' গল্পে কলকাতার জীবনে নায়ক নায়িকার প্রেমের অন্তঃসার শূন্যতাই প্রকাশিত হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের পর নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে নায়ক নায়িকা তাদের দুজনের বাবার বিরুদ্ধাচারনের ভয়ে এবং তীব্র মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে দগ্ধ হয়ে রোমান্টিক প্রেমের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। অংশুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে ট্রেন থেকেনেমে বাড়ি যেতে যেতে হিমানী তাই অংশুর হাতে টেনে দেওয়া সাঁথির সিঁদুর আঁচল দিয়ে মুছে নেয়। 'হলদে চিঠি'তে আনন্দ চাকরীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলেও কলকাতার চাকরীজীবি মানুষের দশটা - পাঁচটা জার্নি, চাকরী শেষে অবসর প্রাপ্ত পঙ্গুজীবন, স্ত্রী ও ঝি চাকরের কাছে, বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছে সম্মান হারিয়ে বিষন্নতায় ডুবে থাকা, ইনক্রিমেন্ট, দাবিদাওয়া, কেরাণী হরেনবাবুর মতো কলহপূর্ণ পারিবারিকজীবন খড়্গপুরে চাকরী হওয়ার জন্যে প্রেমিকা নমিতার আপত্তি -এইসব চিন্তা করতে করতে 'চাকরিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলো তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।'[48] অ্যাপয়েন্টমেন্টের হলদে খামটা xxxxxxxx হাতে নিয়ে এই অভিজ্ঞতা লাভ করে চাকরি পাওয়ার প্রথম দিনেই আনন্দর কাছে সমস্ত পৃথিবী বিবর্ণ বিস্বাদে ভরে যায়।

এছাড়া 'প্রতিপক্ষ' গল্পের ইন্দু গানের চেয়ে শিখাকে ভালোবাসত বেশী। তাই সরস্বতী পুজোয়, অফিসে, কলেজে জলসায় যখন কেবল ইন্দুরই আহ্বান আসে। শিখার আসে না তখন শিখাকে সঙ্গে নিয়ে সেই অনুষ্ঠানে দুজনেই সঙ্গীত পরিবেশন

---

৪৮. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -১০ (গল্প -হলদে চিঠি), জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, ১ম প্রকাশ
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ৩০২।

করে এবং শিখার সন্তুষ্টির জন্যে উদ্যোক্তাদের নাম করে লুকিয়ে নিজের কাছ থেকে টাকা দিয়ে ইন্দু শিখাকে সন্তুষ্ট করে। এই ঘটনা একদিন শিখার কাছে প্রকাশ হয়ে গেলে শিখা লজ্জায় ও কান্নায় ভেঙে পড়ে। এই আঘাতে ইন্দু গান ছেড়ে দিয়ে হয়েছে দোকানদার আর শিখা হয়েছে কর্পোরেশনের স্কুলের শিক্ষিকা। 'ট্যাক্সি-ওয়ালা', 'গলি', 'পাইপ' গল্পতেও আছে কলকাতারই জীবনচিত্রায়ন। 'পিলটি' গল্পের হিমাংশু চৌধুরী কলকাতারই একজন জমি ও বাড়ির দালাল। 'নীলকণ্ঠ', 'অভিনয়', 'হয়তো' গল্প নগরজীবনে অভ্যস্ত পরিবারের স্বামী - স্ত্রীদ্বন্দ্বের নিখুঁত দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই গল্পগুলিতে স্বামী স্ত্রী দ্বন্দ্ব শেষপর্যন্ত মিলনের পরিবেশ রচনা করেছে। 'গোত্র' গল্পে আছে চারিত্রিক শিথিলতার পরিচয়। 'ইন্টারভিউ' গল্পেও প্রতিফলিত হয়েছে দারিদ্র্যপীড়িত কলকাতার পারিবারিক জীবনের ছবি। 'একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকায়' নিত্যানন্দ চৌধুরীর মুখে গরীবপ্রীতি ও টালীগঞ্জের বস্তি উচ্ছেদ তথাকথিত বিত্তবান মানুষদের মুখোসটিকে খুলে দিয়েছে। এছাড়া 'কমিশন', 'মুকুন্দর পাত্রী', 'মদনভস্ম', ও 'মর্যাদা' গল্পে মহানগরী কলকাতাই গল্পের পটভূমি। 'অকলঙ্ক', 'ছোরা' গল্পেও আছে নগরজীবনেরই চিত্র। 'সাপের মাথার মণি', 'নকল', 'সিংহ', 'চায়ের বিকেল', 'পদধ্বনি' প্রভৃতি গল্পেও কলকাতার জনজীবন থেকেই লেখক গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন।

...